নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

নির্বাচিত সংকলন

দেশের মানুষের ও পরিবেশের
চরিত্র অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি
তৈরি হওয়া দরকার।

নবদিশা
শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

আত্মপ্রকাশের আয়োজন

শিক্ষা শুধু শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ নয় - এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেই নবদিশার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আর কোনও অস্পষ্টতা থাকেনা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখে স্পষ্ট করেই বলা দরকার যে শিক্ষার মাধ্যমে শরীর ও মনে একজন গোটা মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন, আত্মপ্রকাশের সেই আয়োজন কোথায়? শুধুমাত্র শিক্ষার অধিকার আইন প্রবর্তন করেই কি এই আয়োজন সম্পূর্ণ হবে? সত্যি কথা বলতে কী, এই প্রশ্নগুলির উত্তর অপ্রয়োজনীয়। আর এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও কেউ দায়বদ্ধ নয়। অন্তত দায়বদ্ধতা স্বীকারে কেউ রাজী নয়। বরং বলা যেতে পারে যে শিক্ষার অধিকার আইন প্রবর্তন করে সরকার তার দায় সেরেছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তাই মানুষের আত্মপ্রকাশের আয়োজনের পরিবর্তে শিক্ষার বাজারীকরণ এখনও সমানে বহাল এবং বেসরকারী স্কুলের নামে শিক্ষার কারখানাগুলির সংখ্যা আরও দ্রুত বর্ধমান। মহানগর ছাড়িয়ে জেলাশহর ও মফস্বল শহরগুলিতেও তার সুদুরপ্রসার।

এখন নেতিবাচক এই প্রসারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কথিত মানুষের আত্মপ্রকাশকেই অনিবার্য করে তুলতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আর আত্মপ্রকাশের এই অনিবার্য প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষ তথা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের ভুমিকা সুনিশ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়েই নির্ভর করবে মানুষের এই আত্মপ্রকাশের সাফল্য। নবদিশা সেই প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্রমশ অগ্রসরমান। আরও বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে যে সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে স্থানীয় ভূগোল, ইতিহাস, স্থানীয় সংস্কৃতিকে যুক্ত করার মাধ্যমে পড়ুয়াদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগকে অনিবার্য করে তুলতে চায় নবদিশা।

সত্যি কথা বলতে কী, এই শিক্ষা হবে পড়ুয়ার জীবনচর্চা বা জীবনচর্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই আরও একটি প্রশ্ন, শিক্ষার অধিকার আইন দিয়ে কি এই জীবনচর্যাকে উপলব্ধি করানো যায়? আইন করে হয়ত কিছু নিয়মকানুনের জন্ম দেওয়া যায় কিন্তু মানুষের হৃদয় বা জীবনের স্পন্দনে নতুন কিছু যোগ করা যায়না এবং স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষের নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন কোনও মাত্রাও সৃষ্টি করেনা। তবে একথাও এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতারও বিরোধী নয় নবদিশা। কিন্তু শিক্ষার যে ভিত, শিক্ষার যে প্রাথমিক পাঠ, আর সেখানে পাঠ্য বিষয়ের যে আবহ বা যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি হওয়া উচিত, তা অবশ্যই হতে হবে পড়ুয়ার নিজস্ব পদচারণাময় জীবন সম্পৃক্ত পায়ের তলার মাটি বা ভৌগোলিক এলাকা থেকেই।

তাই একথা পুনরায় বলা দরকার যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির আন্তরিক প্রচেষ্টাই এখন প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে একমাত্র সহায়ক। আর তাঁদের সহায়তাকে সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নবদিশার এই সংকলন আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এক জরুরী পদক্ষেপ। এখানে উল্লেখ্য যে এই সংকলন হলো ইতিপূর্বে প্রকাশিত নবদিশা-র সাতটি সংখ্যা থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা বিশেষ বিশেষ রচনার এক অনবদ্য সমারোহ, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে নবদিশার তরফে এ এক সম্পূর্ণ মানুষের আত্মপ্রকাশেরই আয়োজন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়ঃ

- শিক্ষানীতি কি হওয়া দরকা ১
- শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেটা আইন দিয়েই কি আদৌ সম্ভব ? ১
- স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ২
- শিক্ষার বাকি ইতিহাস ৩
- বিদ্যালয়-স্তরে কৃষিশিক্ষা বাংলাদেশ পারলে আমরা কেন পারবো না ? ৪
- ধর্ম কি শিক্ষার বাইরে ৪

শিক্ষায় নবদিশা নিয়ে কয়েকটি কথা ৫

শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয় : স্যর কেন্ রবিনসন ৬

এই সময় ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ৭

বর্তমান শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার সন্ধানে ৯

নঈ তালিম এবং গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা ১১

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষা ভাবনা ১২

আদর্শ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ - স্বপন কুমার ঘোষ ১৪

উইলিয়াম অ্যাডাম্স্-এর চোখে ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র ১৬

গণশার চিঠি - লীলা মজুমদার ১৯

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষাঃ

- নিকোলাই ফ্রিদরিক সেভেরিন গ্রুনউইগ ২০
- জে. কৃষ্ণমূর্তি ২২
- ইভান ইলিচ ২৪
- মারিয়া মন্টেসরি ২৬

কেন সংস্কৃতির চর্চা ২৭

লোকায়ত সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ভাবনা.. ২৮

শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রাসঙ্গিকতা ২৯

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গঠন ৩০

শিক্ষার অর্থ - কে কে খুল্লার ৩১

এসো তাঁদের গল্প শোনাইঃ

- অতীশ দীপঙ্কর ৩৪
- বিরসা মুন্ডা ৩৫
- গুরুসদয় দত্ত ৩৬
- কবীর ৩৭

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশের সংকলন ৩৮

উন্নয়নের অতীত ও বর্তমানঃ নতুন পথের সন্ধানে ৪১

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষা ৪৩

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ঃ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৪৪

স্থানীয় জ্ঞানের ঐতিহ্য ৪৪

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫' এর প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ৪৫

স্কুল স্থানীয় সম্পদকর্মীদের ব্যবহার করতে পারে ৪৫

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু সম্ভাব্য খসড়া ৪৬

সেই সময়ঃ

- মানভূম ৪৮
- কুচবিহার ৫১

জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো: এক ঝলক ৫৪

"জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫" কিছু নির্বাচিত অংশের সংকলন ৫৫

গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টিবাগানের প্রাসঙ্গিকতা ৫৮

বহুমুখী শিক্ষা কি ? ৫৯

শিক্ষার্থীরা কোন জীববিদ্যা শেখে ৫৯

নাটিকাঃ এ কোন শিক্ষা? ৬০

কোন পথে শিক্ষাঃ একটি ছোট গল্প ৬১

সম্পাদকীয় সংকলন

শিক্ষানীতি কি হওয়া দরকার

প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সমাজ যে জ্ঞান সমূহ অর্জন করেছে, একটা শব্দে তাকেই আমরা শিক্ষা বলি। প্রশ্ন হল আগামী প্রজন্মের কাছে সেই জ্ঞানসমূহ অর্থাৎ শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যায় কী ভাবে? শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যেহেতু শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম নয়, তাই একটা নীতির প্রয়োজন হয় কাঠামোটাকে ধরে রাখার জন্য। প্রাচীন শিক্ষানীতি কি ছিল সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। টোল বা চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা নামে দুধরণের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সে গুলি সমাজের জ্ঞানী মানুষরাই চালাতেন। সমাজই তাদের স্থান দিত, আর রাষ্ট্র সেখানে ছিল নিমিত্ত মাত্র। প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব বা ব্রহ্মত্ব অর্জন। এই শিক্ষানীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল-ক) এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষা সমাজের সকল সদস্যের জন্যই বরাদ্দ ছিল, আর ঘরে ঘরে বা পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ ছিল সেই জ্ঞান বিতরণের সামাজিক জায়গা। খ) মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাই এই শিক্ষানীতির প্রধান বিষয় ছিল – মানুষের ধর্ম, সমাজের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই যাতে শিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ সমাজ নির্ভর একটা শিক্ষানীতি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশে আগমনের ফলে ব্রিটিশ সভ্যতার ঝলকানিতে মুগ্ধ হয়ে এদেশের শিক্ষানীতি নির্নয়ক বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শিক্ষানীতি-টাকেই জলাঞ্জলি দিলেন। ওদিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিরোধে সমাজ কোণঠাসা হতে লাগল। তার ফলে আমাদের টোল চতুষ্পাঠী ও পাঠশালাগুলি অনাহারে এবং অপুষ্টি রোগে ভুগতে ভুগতে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাচীন শিক্ষানীতিগুলির ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি চালু হল। অন্ধের মতো আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। ফলে আমরা প্রাধান্য দিলাম মানুষকে টাকা রোজগারের যন্ত্র বানানোর শিক্ষাকে আর জলাঞ্জলি দিলাম মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাকে। সেই ইংরেজদের স্কুল-কলেজের অনুকরনেই আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হল যার অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় সহায়তায়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন "অতীতের সঙ্গে আত্মবিচ্ছেদেই ভারতীয় দুর্দশার প্রধান কারন"। ফলতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠল "বিদ্যাকারখানা"। সন্তানকে পড়াবেন বিদ্যাকারখানায় আর আশা করবেন সে মানুষ হবে, তা সম্ভব নয়। সে বড়জোর অনেক টাকা রোজগারের যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আয়তনে যে পরিমাণে বেড়েছে, তাদের ভিতর থেকে জ্ঞানরসের চর্চা বা প্রকৃত শিক্ষা সেই পরিমাণে কি বেড়েছে? আসলে ছেলেমেয়ে জন্মালেই তাদের ধরে নিয়ে সেই বিদ্যাকারখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের যন্ত্র বানাতেই হবে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষাবিদরা খেয়াল করেন না, প্রাকৃতিক আলোর প্রধান উৎস যেমন সূর্যের আলো, জ্ঞানের আলোর প্রধান উৎস সেরকম স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জ্ঞান; যা প্রতিটি মানুষের ভিতরে, প্রত্যেক মানব শিশুর মনের গভীরে, মানুষের চারপাশের প্রকৃতিতে, প্রতিটি সত্তার ভিতরে এবং সত্তার সঙ্গে সত্তার সম্বন্ধের নিয়মে মানুষের ভিতরে পুঞ্জীভুত থাকে। সূর্য ছাড়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক আলোর উপর নির্ভর করে যেমন মানুষের সমাজ বাঁচতে পারে না, তেমনি জগতের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জ্ঞানের আলোকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের কথা হল সূর্যের আলোও চাই, বৈদ্যুতিক আলোও চাই। উভয়কেই তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কারন মানুষের আবিষ্কৃত কোন জ্ঞানই ফেলে দেওয়া যায় না, তা সে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, গাণিতিক বা মানসিক হোক । আর এই কথা মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষানীতি তৈরি হওয়া দরকার। তাই চলতি পাঠ্যক্রম যেটা আছে সেটার মধ্যে আঞ্চলিক কিছু বিষয় সংযোজন করা দরকার যেমন স্থানীয় সংস্কৃতি, ভুগোল, ইতিহাস বা জীবনযাপন পদ্ধতি, যা কেন্দ্রীয় ভাবে সম্ভব নয়। একমাত্র আমাদের পঞ্চায়েতগুলি সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করে যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে তবেই একটা বাস্তব সম্মত শিক্ষানীতি তৈরি হবে। সুখের কথা এই যে ২০০৫ জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোয় উপরের ভাবনাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল তা কার্যকরী করবে কে? পাঠ্যক্রমে যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলিকে প্রথমে শিক্ষক মহাশয়দের বুঝতে হবে এবং আত্মস্থ করতে হবে। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন। বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে একদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা, স্কুল পরিচালন কমিটি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, অবিভাবকমণ্ডলী এবং অন্যদিকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিত ভাবনাই হয়ত আঞ্চলিক নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি স্কুলে এক নতুন রূপে অবতীর্ণ হতে পারে।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার
কিন্তু আইন দিয়েই কি আদৌ সম্ভব ?

" মানুষের অধিকার মানুষকে চেয়ে নিতে হবে না। অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা, বাহিরের লোভে অন্তরের লোকসান ঘটে। "

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শিক্ষার অধিকার আইনটি সফল ভাবে প্রয়োগ হলেই কি সমাজ জীবনে শিক্ষার উন্নয়ন হবে ? আমরা কি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন চাইছি, না নিরক্ষরতার উন্নয়ন চাইছি। শিক্ষা কেবলমাত্র

স্কুলের ক্লাসঘর আর ব্যাক বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ সংস্কৃতির এটা একটা অঙ্গ যা জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতার মধ্যেই পড়ে এবং দৈনন্দিন জীবনে যা একটা প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের উপরই।

মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির দিকে যদি আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে সবই এক ছাঁচে ঢালা। মূলত শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা; অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক বিষয় সমূহের সঙ্গে শুরুতেই তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তাই বর্তমান শিক্ষা বিষয়ের ধ্যান ধারণাকে খুঁটিয়ে বিচার করে নতুন করে সংযোজন করবার দিন এসেছে। বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী, স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান কিভাবে একযোগে কাজ করতে পারে সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। যদিও শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু আইন দিয়ে কি তার প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব ! এতে কি শুধু রাষ্ট্রই দায়বদ্ধ থাকবে নাকি সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ দায়বদ্ধ থাকবে ? সংবিধানে ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানকে গ্রামীণ শিক্ষার দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিল। কারণ অন্তত প্রাথমিক-স্তরে শিক্ষার বিষয়বস্তুর চাহিদাটা অঞ্চল-ভিত্তিক। স্থানীয় ভাবে শিক্ষার উন্নয়ন এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার তার এলাকায় চলা প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের নিয়মিত তদারকি করবে, প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কোথাও বলা নেই যে, অঞ্চলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে অঞ্চলভিত্তিক বিষয়কে পঠন পাঠনের বিষয়বস্তুতে সংযুক্তি ঘটাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে স্থানীয় ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গ্রামবাংলায় যেসমস্ত সম্পদ আছে যেমন লোককাহিনী, গল্প, বিভিন্ন গোষ্ঠীর গান এগুলো শিশুদের কল্পনা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষেরা তাঁদের জীবন জীবিকার উন্নতি ঘটাতে পারে যা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যে পড়ে। সেই দক্ষতা এবং জ্ঞানকে যদি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে চালিত করা যায় তাহলে আর শিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। হাতে কলমে গ্রামীণ জীবন যাপনের উপযোগী নানান কাজ করতে গিয়ে তারা বাস্তব জীবনে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করার একটা প্রেরণা পাবে। এই সম্পূর্ণ কাজটা শুধু আইনি অধিকার বলে হবে না। বরঞ্চ ব্যক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক সহমতের ভিত্তিতেই হবে। কারণ ব্যক্তি একটা বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ, আর শিক্ষাও একটা সামাজিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ব্যাপার। সেই জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের হাত ধরে এভাবেই যদি শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম প্রকৃত মানুষ না হয়ে পরিণত হবে যন্ত্রমানুষে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জোরটা পড়ে যন্ত্র চালনায় দক্ষ ও নিপুণ শ্রমিক তথা কারিগর তৈরি করার উপর আর আমাদের বিদ্যালয়গুলি এই তথাকথিত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় চাহিদা মেটাবার কেন্দ্র- বিন্দু হয়ে উঠছে।

তাই স্থানীয় অঞ্চলভেদে পাঠ্যক্রমে কি বিষয় হবে সেটা স্থানীয় মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের হাতেই থাকা উচিত। ধরা যাক, শিক্ষার অধিকার আইন বলে সব ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলো। সেখান থেকে তারা যা পড়ছে বা শিখছে সেগুলি কি গ্রামীণ পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? তা যদি না হয় তাহলে স্কুল ছুটের সংখ্যাটা তো ক্রমশঃ বেড়েই চলবে। আটকাবার পথটা তাহলে কোথায়? শিক্ষা অধিকার আইনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে জরুরী বিষয় সেটা হল এমন একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আনা, যার মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের সব উপাদানগুলিই থাকবে। বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও তা হবে বাস্তব ভিত্তিক ও সহজলভ্য।

আইন দিয়ে যা করা যায় না সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই তা লুকিয়ে থাকে, আমাদের কর্তব্য হল সেটাকে জাগিয়ে তোলার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালিয়া যাওয়া।

স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

পঞ্চায়েতকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিন্তু মনে রাখতে হবে পঞ্চায়েত গ্রাম সমাজের স্বশাসনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আর সেই হেতু স্কুলটা সমাজের বাইরের প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ আছে। তাই স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেমন স্কুলের শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, গ্রামের নানা পেশার মানুষ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকমণ্ডলী ইত্যাদিদের ভূমিকা আছে, তেমনই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতিরও একটা ভূমিকা আছে। কারণ স্থানীয় পরিকল্পনায় এদের অংশগ্রহণ খুব জরুরী। আর স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনা মানে তো শুধু পরিকাঠামোগত অর্থাৎ ক্লাসঘর, টয়লেট, খেলারমাঠ নয় সেই পরিকল্পনায় থাকতে হবে গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের স্থানীয়ভাবে কি বিষয় শেখানোর আছে এবং কিভাবে শেখানোর দরকার অর্থাৎ শেখা ও শেখানোর বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় ভাবে যদি প্রাসঙ্গিক শিক্ষা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে দিতে চাই তাহলে স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্থানীয় ভাবে আমাদের গ্রামের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গ্রাম পঞ্চায়েত। যা গ্রাম জীবনের সঙ্গে মিশে আছে।

গ্রামের অন্যান্য উন্নয়নে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব আছে তেমনই শিক্ষাও উন্নয়নের একটা বড় সূচক তৈরি করে। গ্রামে স্থানীয় ভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে কি শিখবে বা কি শেখানোর দরকার সেটা কে ঠিক করবে? যদি ধরা যায় ঠিক করবে সরকারী

স্কুল দপ্তর, তাহলে সেটা কি প্রাসঙ্গিক হবে? শহরের সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার অনেক তফাৎ। গ্রামীণ অঞ্চলের ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, জীবন সম্পর্কে প্রত্যাশা, স্বপ্ন একরকম আর গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের চাহিদা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন আরেকরকম। তাই প্রাথমিক স্কুল উন্নয়নের পরিকল্পনায় গ্রামের কাছের মানুষের প্রতিষ্ঠান, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা থাকা দরকার। আজকে এই চিন্তার প্রতিফলন আমরা জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম (২০০৫) এ দেখতে পেলেও আজ থেকে বহুবছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মশক্তি প্রবন্ধে বলেছেন " স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে । কেহ কাড়ে নাই এবং কোনদিন কাড়িতে পারে না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা করিতে পারি যদি ইচ্ছা করি, এক হই, এর জন্য সরকারের দরকার নেই"। অন্যদিকে ভারতের সংবিধানের ২৪৩ জি, ধারার ৭৩ তম সংশোধনীতে দায়িত্ব দিয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েতকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ন্যায়ের সাপেক্ষে পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য। ৭৩তম সংশোধনী ছাড়াও ৯৩তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব সরকারের বিভিন্ন স্তরের ভাগ করে নেওয়ার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে । যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে থাকে, তাই গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চায়েতের অবশ্য কর্তব্যই হয়ে দাঁড়ায়। এটা বাঞ্ছনীয় স্থানীয় ভাবে পঞ্চায়েত শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে এবং তার স্থানীয় ভাবে গুণমানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। শুধু তাই নয় স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থপূর্ণ ভাবে যুক্ত করা হবে এবং স্কুল পরিকল্পনার মধ্যে আনতে হবে।

পঞ্চায়েতের এই নিবিড় সংযোগ শিক্ষাকে আরও অনেক বেশি দায়বদ্ধ ও জনমুখী হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। স্থানীয় সরকারের এই প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে এটা আশা করা যায় যে জনগোষ্ঠীকে তার শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য তথাকথিত উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের দিকে যেতে হবেনা। পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত পরিসরেই তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন, পরিকল্পনা এবং প্রত্যাশা তারা জানাতে পারবে। শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। তার জন্য যান্ত্রিক নিয়মে শিক্ষা, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানা ঘরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় না এসে যদি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে,তাহলে হয়তো আমাদের গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা উওরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে যাওয়া জ্ঞানের একটা চর্চার সুযোগ পেতে পারে। স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার বাকি ইতিহাস

শিক্ষা মানুষের জন্য আর শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মানুষকে মানুষ হতে হয় । মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না । তাই জরুরী তার জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা । তার নিজের পরিচয় জানা, সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, পৃথিবীতে তার দায়িত্ব – কর্তব্য আছে কিনা, থাকলে তা কি ভাবে পালন করতে হবে এ সবই মানুষের শিক্ষার বিষয়। সঙ্গত কারনেই মানুষকে ভাবতে হয় শিক্ষার বিষয় ও তার পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষা শব্দটি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি আছে। বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়াই শিক্ষা আর সেই কর্মকাণ্ড হবে স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। জীবনের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে কোন মিল নেই। আসলে জীবন যেমন হওয়া উচিত শিক্ষা ও তেমন হওয়া দরকার। জীবন ও শিক্ষা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ - এই ভাবনাটাই সাধারনভাবে নেই। একঘেয়ে নীরস পুঁথির পাতায় বন্দী হয়ে থাকে শৈশবের জীবন। শিক্ষকরাও আনন্দের সোনার কাঠি রুপোর কাঠির পরশ দিতে পারে না ছেলেমেয়েদের, তার ফলে অনেকেই স্কুল ছেড়ে দেয়। গ্রামের অনেক গরীব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায়। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাই বাড়াচ্ছে। অধিকাংশ পড়াশোনা শেষ করে না। কেননা তাদের অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, না পাবে শহরে চাকরি আর না পারবে গ্রামের কৃষির কাজ। মাঠের কাজ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে অনেকেই স্থানান্তরনের পথে পা বাড়াচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে কলমে দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাকে যদি যোগ করা যায়, তাহলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দ মত পেশা বেছে নিয়ে গ্রামীন পরিবেশে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারতো। যেমন ধরা যাক, ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা গ্রামের একজন অভিজ্ঞ চাষির সাহায্য নিয়ে একটা পুষ্টি বাগান করলো ইস্কুল প্রাঙ্গণে। এর ফলে ছেলেমেয়েদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার একটা সুযোগ তৈরি হল। ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি পাঠ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রায়োগিক কৃষি শিক্ষার ওপর বাস্তব ধারণা লাভ করলো। বাগানের পরশে ছেলেমেয়েদের কৃষি মনস্কতা গড়ে উঠলো। এইভাবে বিদ্যালয়ের বাগান কৃষি শিক্ষার জীবন্ত বিদ্যাপীঠ রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটালো। এইখানেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ভিত্তিক শিক্ষার সংযোগ গড়ে উঠলো। শুধু জীবিকা নয় স্থানীয় ভূগোল, ইতিহাস, সমাজের যে গনতান্ত্রিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে, যাকে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত বলি তা জানতে ও বুঝতে হবে, বিদ্যালয়ের মধ্যে তার চর্চা করতে হবে।

এ তো গেল স্থানীয় চাহিদা, আর একটা দিক আছে যেটা বস্তু দিয়ে বোঝা যায় না অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়। সেটা হল নিজেকে জানা, এই জানার নামই শিক্ষা। মনে রাখতে হবে, মানুষ হচ্ছে দৈহিক ও আত্মিক জীব। শুধু মাত্র জীবিকা নির্ভর

শিক্ষা নয় পরিপূর্ণ মানুষ রূপে ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, সেটা শিক্ষার একটা বড় দিক। আর এক দিকে মানুষের যে ধর্ম সেটাও শিক্ষার অঙ্গ। যেমন ধরা যাক ফকির, সুফি-ভক্তির শক্তিশালী ধারা যা আমাদের সমাজকে আগে টিকিয়ে রেখেছিল যার সঙ্গে জীবনযাপনের বিশেষ চর্চার প্রশ্ন জড়িত ছিল। মানুষের বাইরে একদিকে প্রকৃতি এবং অন্যদিকে অপরাপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের চর্চার সুনির্দিষ্ট ধারার মধ্যেই তাদের বয়ান গড়ে উঠেছে। এইগুলোও শিক্ষার একটা বড় ধারা। যা আমাদের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা সেতু বন্ধন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানবধর্মের এই বিষয়টা শিক্ষাঙ্গনে বাচ্চাদের মধ্যে চর্চার কোন সুযোগ নেই। অথচ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনটা আলগা হয়ে যাচ্ছে ততই এটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তাই শিক্ষার কাজ হল জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটা বোঝাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করা।

বিদ্যালয়-স্তরে কৃষিশিক্ষা

বাংলাদেশ পারলে, আমরা পারবো না ?

'নবদিশার' 'সপ্তম সংকলন' প্রকাশিত হচ্ছে। এখন সমস্ত গ্রামবাংলা জুড়ে আদিগন্ত খোলা মাঠে নেমেছে আশীর্বাদ-এর মতো বৃষ্টি। যতদূর চোখ যায় শুধু চাষের আয়োজন। এর পাশাপাশি গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলেছে গ্রামবাংলার স্কুলগুলি। সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে পড়তে অথবা লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে তাকাচ্ছে বৃষ্টিভেজা মাঠের দিকে,সেখানে তৈরি হচ্ছে তার পরিবারের, তার অঞ্চলের ফসল। সে দেখে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তার ঘরে আলোচনা চলছে, এবার কোন বীজ ? কোন সার ? সে দেখে বাড়িতে যেন আলোচনা এবার একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে বুঝতে চায় কেন এবং কি জন্য ? তাহলে কি সবকিছু আগের মতো নেই ? শিশু মনের এসব বিড়ম্বনা তাকে পাঠে মনোযোগ দিতে দেয় না।

'নবদিশা' চায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হোক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যেই। যদি বাংলাদেশ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারে, এবং নতুন প্রজন্মের সামনে কৃষিকে গ্রহণীয় পেশা হিসেবে তুলে ধরতে পারে, তবে আমরা কেন পারব না ? শুধু মাত্র নতুন মধ্যবিত্ত, যারা ডিজিটাল ভারত দেখতে চায়, তাদের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাবো ? নবদিশা মনে করে, না - কখনো নয়। বাংলাদেশ বিদ্যালয়স্তরে কৃষিশিক্ষাকে দেখেছে সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে। তারা মনে করে বিদ্যালয়স্তরে কৃষিশিক্ষা জরুরী, কারণ এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে কৃষিমনস্ক একটি নতুন নাগরিক সমাজ,যারা সচেতন থাকবে দেশের শস্য, মাছ, অরণ্য এবং জৈব বৈচিত্র্যের অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে। সময় এসেছে নতুন করে বিদ্যালয় পাঠক্রমকে ভাবার, যেখানে প্রতিফলিত হবে কৃষি এবং সংযুক্ত ক্ষেত্র। ছেলেমেয়েরা জানবে চাষ, শুধু বিকল্পহীনতার আশ্রয় নয়, বরঞ্চ হতে পারে অন্যতম লাভজনক পেশা এবং এই পাঠক্রমে আমরা চাই প্রতিফলিত হোক সুস্থায়ী কৃষির পদ্ধতি প্রকরণ। উঠে আসুক পশুপালনের সমস্যা সম্ভাবনা, সবজি – বাগানের নতুন প্রণালী, মাছ চাষের বিজ্ঞান।

সারা বাংলায় এই পাঠক্রম পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা হোক। যদি মনে হয় প্রথমে ঐচ্ছিক হিসাবে আনা উচিত, তবে তাই হোক। কারণ ভারতবর্ষ গ্রামে বাস করে। আর গ্রামের আবাস কৃষি। 'নবদিশার' এক শান্ত বিপ্লবের অপেক্ষায় রইল।

ধর্ম কি শিক্ষার বাইরে

আমরা অনেকেই মনে করি শিক্ষা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত। কিন্তু শিক্ষার যেমন একটা সামাজিক দিক আছে, একটা সাংস্কৃতিক ভিতও আছে। যেগুলো প্রতীকী বা প্রতীকমূলক (আত্মিকতা, মূল্যবোধ, ধর্ম, ধর্মীয়বিধি, আচার অনুষ্ঠান), সেগুলো শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন।

প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী দেখা যায় যখনই পৃথিবীতে অশান্তি অনাচার বা অনাসৃষ্টি দেখা দিয়েছে, তখনই দিশেহারা মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করার উদ্দেশ্যেই নানা ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। পাশাপাশি কল্যাণময় জীবন যাপনের জন্য কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে। যেটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক সেটা হল পৃথিবীতে নানা ধর্ম নানা মত থাকলেও সবার মর্মবাণী এক-জগৎ ও জীবনের কল্যাণসাধন। আর মধ্যযুগে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ধর্মশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটা নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয় । তার কারণ যাতে আগামী প্রজন্ম বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী বুঝতে পারে এবং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে শেখে ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত হয়। তবে জরুরী কথা হলো এই যে ধর্মীয় দর্শন বা জীবনের আত্মিক উপলব্ধির থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আলাদা করে বুঝতে পারাটাও দরকার। জগতকে সামগ্রিকভাবে দেখার কথা সব ধর্মের মধ্যেই বলা আছে। এই মূল্যবোধ জ্ঞানলাভের এবং সমাজে মানুষের একসাথে মিলেমিশে থাকার মূলভিত্তি। এখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে আগামী প্রজন্ম কি করে প্রতিটি ধর্মের মূল বাণী উপলব্ধির সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধকে সদা জাগ্রত রাখতে পারে, তার উপযুক্ত পদক্ষেপ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই গ্রহণ করা জরুরী।

শিক্ষায় নবদিশা নিয়ে কয়েকটি কথা

শিক্ষা শব্দটা দুটো অক্ষর দিয়ে তৈরী হলেও এর ব্যাপ্তি বিশাল। মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা নিজের মতো করেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আর এই ব্যাখ্যাটাকেই নবদিশা মনে করে সঠিক অথবা হওয়া উচিত। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও পর্যন্ত অন্ন,বস্ত্র এবং বাসস্থানের সাথে সমান করে দেখতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত না হলেও এর বিশালতা নিয়ে বিদগ্ধ মহলে আলোচনা আজ সুদূরপ্রসারিত।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এই শব্দদুটো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আসলে শিক্ষার ধারণাকে যদি শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি তাহলে এর বিশালতাকে ছোট করে দেখা হবে। আজ প্রয়োজন এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং যথাযথ প্রয়োগের। স্বাধীনতাপূর্বকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি যে ইংরেজদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তা লর্ড মেকলে সাহেবের সেই সময়ের বক্তৃতা থেকেই জানতে পারা যায়। তিনি বলেন "...এই দেশের আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা তাদের মেরুদন্ড,তাকে নষ্ট না করতে পারলে আমার মনে হয় আমরা কখনই এই দেশ জয় করতে পারব না। এজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, আমাদের তাদের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী শিক্ষাব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তে এমন কিছু করা দরকার যাতে তারা ভাবে যে যা কিছু বিদেশী এবং ইংরাজী তাই ভাল ও উন্নত। এর ফলে তারা তাদের আত্মসম্মান এবং তাদের দেশীয় সংস্কৃতি হারাবে এবং পরিণত হবে সর্বতোভাবে এক পরাধীন জাতিতে ঠিক যেমন আমাদের প্রয়োজন।"

সেই সময়ে মেকলে সাহেব যা বলেছিলেন তাঁর সরকার তা কাজে করেও দেখাতে পেরেছে। আর স্বাধীনতা উত্তরকালে সেই ফলাফলেরই নিদর্শন আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। যেমন - গ্রামীণ শিক্ষার বিষয়বস্তু রয়ে গেল শহরকেন্দ্রিক এবং পশ্চিমী ধাঁচের কিশোর ও যুব সমাজ স্থানীয় ঐতিহ্যশালী জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, গ্রামীণ হতাশ যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি-যারা নিজেদের সমাজেও জায়গা পায় না, আবার শহরের চাকরির প্রতিযোগিতার জন্য অনুপযুক্ত সম্প্রদায়গুলি তাদের পরিচিতি হারিয়ে বঞ্চনা দারিদ্র্য এবং প্রান্তিকতার স্বীকার হতে থাকে

এহেন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছু বিচ্ছিন্ন সংশোধনমূলক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- সর্ব শিক্ষা অভিযান
- ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও বিনা পয়সায় শিক্ষা – শিক্ষার অধিকার আইন কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা বিকল্প স্কুল চালানোর উদ্যোগ, রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তিমূলক বোর্ড গঠিত হয় যেখানে স্কুলছুটদের জন্য কিছু বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম তৈরী

শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বৈষম্য কোন সামাজিক অবস্থাতেই নতুন কোন ঘটনা নয়। যার ফলে কিছু ত্রুটি সবসময়েই লক্ষ্য করা যায়। উপরে লিখিত প্রায় সব ক'টি ব্যবস্থাই শহরের দিকে তাকিয়েই চালু হোল। যদিও সর্ব শিক্ষাকে অভিযান এর থেকে কিছুটা হলেও আলাদা কিন্তু গ্রামে সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারি করাটা খুব প্রয়োজন,কিন্তু তার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। কিন্তু শহরকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাব্যবস্থা যা গ্রামের গরীব পরিবারের যুব সম্প্রদায় গ্রহণ করে থাকে তা গ্রামীণ প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার তুলনায় অপ্রচলিত ফলে সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়কে দুর্বল করে দেয়। একই সাথে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ হওয়ার বদলে ক্রমে তা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এর ফলে নিজস্বতা হারানো মানুষেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এহেন পরিস্থিতিতে নবদিশা শিক্ষাজগতে একটু অন্য চিন্তা ভাবনা আনবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এমন এক বৃত্তিমূলক ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা দরকার যা হবে দ্বিমুখী।এছাড়া এই ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে, যা যুব সম্প্রদায় তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের এমনভাবে ক্ষমতায়ন করবে যাতে তারা সক্ষম হবে অভাব, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের সম্মুখীন হতে। এক কথায় এই কাজটির মূল লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের গ্রামীণ অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ।

জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা (National Curriculum Framework) ২০০৫-এ নানান উৎসাহমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে এও বলা হয়েছে"...পাঠ্যসূচী পরিবর্তন এখনও প্রায় সব স্কুলে কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়। স্কুল শিক্ষা শিশুদের জীবনের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। কার্যক্রম না কমিয়ে আরও বাড়ানোর প্রয়োজন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দরকার যা বিশেষ করে (তবে কেবলমাত্র নয়) যুব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় জীবনশৈলী শিক্ষাকে উন্নত করে। যেভাবে এই কাজটা করার কথা নবদিশা ভেবেছে তা হলো- গ্রামীণ বাংলার পরিপ্রক্ষিতে শিশুদের ও তাদের অভিভাবকদের স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, চাহিদা এবং উৎসাহের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক ও জীবনশৈলী শিক্ষার বিষয়টি চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পাঠ্যসূচী/বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচলন করা এবং প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দক্ষতা তৈরির জন্য কর্মশালা অথবা পাশে থাকার ব্যবস্থা করা।

শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয় :
স্যর কেন্ রবিনসন

(স্যার কেন রবিনসন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শিক্ষাকে উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীলতার প্রেক্ষিত হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কেন রবিনসন ২০০৬ সালে টেডএক্স সম্মেলনে চমৎকার বক্তৃতা দেন। যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরি পাওয়ার জন্য করা হয়েছে, যা মোটেও ঠিক নয়। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। পাঠকদের জন্য টেডএক্স সম্মেলনে দেওয়া স্যার রবিনসনের সেই বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হলো।)

আজকের আলোচনা তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চলছে। আমি যা যা বলতে চাই তার সঙ্গে এই বিষয়গুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

একটি হলো এখানে তোমাদের সবার ভেতরই সৃজনশীলতা আছে। এই সৃজনশীলতা নিয়েই আমি কথা বলতে চাই।

শিক্ষার ব্যাপারে আমার সবসময়ই আগ্রহ আছে। সত্যি কথা বলতে, আমি সবার মধ্যেই এই আগ্রহটা খুঁজে পাই। শিক্ষা বিষয়টাই অনেক আগ্রহের! তাই না?

আমাদের পড়ালেখা নিয়ে এতো আগ্রহের কারণ হচ্ছে এই পড়ালেখাই আমাদের এমন এক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায় যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না।

একটু ভেবে দেখো, এই বছরে যেসব শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করবে তারা ২০৬৫ সালে অবসর নেবে। কিন্তু তারপরও আমরা কেউ জানি না আগামী পাঁচ বছর পর এ পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে!

আমি মনে করি প্রতিটি শিশুর মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। আমি মনে করি সব বাচ্চারাই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। যদিও আমরা তাদের ভাবনাগুলোকে অনভিজ্ঞ বলে উড়িয়ে দিই। তাই আমি শিক্ষা সম্পর্কে এবং সৃজনশীলতা সম্পর্কে বলতে চাই। আমি বলতে চাই সৃজনশীলতাও সাক্ষরতার মতই গুরুত্বপুর্ণ।

কয়েকদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম, যা আমি এখন প্রায়ই নানা জায়গায় বলি। ছয় বছরের এক মেয়ে ড্রয়িং ক্লাস করছে। ক্লাসের শিক্ষক দেখতে পেলেন মেয়েটি ক্লাসে একদমই মনোযোগ দিচ্ছে না। শিক্ষক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করছো? মেয়েটি বলল, আমি ঈশ্বরের ছবি আঁকছি। শিক্ষক অবাক হয়ে বলল, কিন্তু কেউই ঈশ্বরকে দেখেনি; এমনকি তুমিও না। মেয়েটির জবাব ছিল, হুম, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই দেখতে পাবে।

শিশুদের তাদের সুযোগগুলো দিতে হবে। যদি বাচ্চারা না শেখে কোন কাজ কিভাবে করতে হবে; তবে তাদের ঝরে পড়তে হবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, শুরুতে ভুল করার ব্যাপারে ওরা একদমই ভয় পায় না। আমি বলছি না ভুল করা এবং সৃজনশীলতা একই জিনিস। কিন্তু যদি ভুল করার ব্যাপারে প্রস্তুত না থাকি তাহলে কখনোই আমাদের মধ্যে আসল অনুভূতি জেগে উঠবে না।

ভুল যদি না করে কিংবা যদি শিশুদের ভুল করতে না দেওয়া হয়, তবে বড় হয়ে তারা তাদের সৃজনশীলতার শক্তি হারিয়ে ফেলে। বড় হয়েও ভুল করার ব্যাপারে ভয় পায়। ভয়ের জন্য কোনও কাজেই মন দিতে পারে না।

আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই পদ্ধতি দেখতে পাই। কোথাও ভুল করলে ক্ষমা নেই। ভুল করলেই চাকরি যাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমরা নির্ভুল করে চালাতে চাই। শিক্ষার বিষয়ে ভুল করা মহা অপরাধের সমান।

এর ফলে অনেক বড় একটি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয় ঠিকই; কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তার সৃজনশীলতা। পিকাসো বলেছিলেন, প্রতিটি শিশুই একজন শিল্পী। কিন্তু ওই শিশু বেড়ে উঠার সময়েই সেই শিল্পী সত্ত্বাটি অকেজো হয়ে পড়ে।

তোমরা যখন যুক্তরাষ্ট্র যাবে তখনই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতা চোখে পড়বে। পৃথিবীর সব শিক্ষা ব্যবস্থাতেই অংক এবং ভাষা শিক্ষা থাকে। তারপর গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে।

পৃথিবীর সব জায়গাতে একই অবস্থা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত, নাটক এবং নৃত্যের থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় বিজ্ঞান, অংক, ভাষা ইত্যাদি বিষয়কে। পৃথিবীর কোথাও এমন কোন শিক্ষক নেই যিনি শিক্ষার্থীদের নেচে দেখান। কিন্তু কেন? আমি মনে করি অংক যেমন গুরুত্বপুর্ণ; ঠিক তেমনি নাচও গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদেরকে অনুমতি দিলে তারা সবসময়ই নাচতে থাকে। কতো সুন্দর লাগে তখন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের অধ্যাপক বানানোর জন্যই তৈরি হয়েছে।

এমনকি আমি নিজেও অধ্যাপকদের পছন্দ করি। শিক্ষকদের নিয়ে আমার নিজের একটা মতামত আছে। তাঁরা সবসময় নিজেদের মধ্যেই বসবাস করে। সেটাও একটা নিজস্ব পরিবেশে। তাঁরা নিজেদের শরীরকে তাঁদের মাথা বহনের জন্য ব্যবহার করেন।

এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। কারণ ছিলো ১৯ শতকের আগে পৃথিবীর কোথাও সার্বজনীন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা মেটাতেই এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ফলে একটা বাচ্চা যা পছন্দ করে তাকে সেই বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। যেমন তাদেরকে গান শিখতে মানা করা হয়, কারণ কারো বাবা মা চায় না তাদের সন্তান সংগীত শিল্পী হোক। তাদের ছবি আঁকতে মানা করা হয়, কারণ সমাজ চায় না কেউ চিত্রশিল্পী হোক।

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যা আমাদের চিন্তাভাবনার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। ফলে অত্যন্ত প্রতিভাবান, সৃজনশীল ব্যক্তিরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। তাদের ভাবনার গতি বন্ধ হয়ে যায়। একসময় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা নিজেদেরকে সমাজের মধ্যে অকেজো ভাবতে শুরু করে।

তাই, আমি মনে করি না আমাদের এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী আগামী ৩০ বছরে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মানুষ স্নাতক সম্মান অর্জন করবে। এতে কী লাভটা হবে? এই শিক্ষিত মানুষগুলোকে দেখা যাবে বাড়িতে ভিডিওগেমস খেলছে। কারণ বাজারে চাকরি নেই।

আমি একটা বই নিয়ে কাজ করছি। বইটির নাম যীশুর আবির্ভাব, যার মধ্যে আমি বিভিন্ন মানুষের প্রতিভা নিয়ে কয়েকটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সেখানে গিলিয়ান নামে এক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তাকে প্রশ্ন করি, কিভাবে নৃত্যশিল্পী হলেন? উত্তরে সে আমাকে মজার গল্প শোনায়।

গিলিয়ান তার বাবা-মাকে নৃত্যশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা জানায়। বাবা মা বিচলিত হয়ে ভাবতে থাকে গিলিয়ানের মধ্যে লার্নিং ডিজঅর্ডার আছে। তাই সে নৃত্যশিল্পী হতে চাইছে।

গিলিয়ানকে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারের কাছে। তার মা ডাক্তারকে সব সমস্যার কথা বলেন। ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। পরে গিলিয়ানকে বাইরে যেতে বলেন। গিলিয়ান বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে ডাক্তার একটি গান ছেড়ে দেন।

এরপর গিলিয়ানের দিকে দুজনই তাকিয়ে থাকেন। ডাক্তার এবং গিলিয়ানের মা দুজনই বিস্ময়ের চোখে গিলিয়ানের নাচ দেখতে থাকেন। ডাক্তার তার মাকে বলেন, গিলিয়ান মোটেও অসুস্থ নয়। সে একজন শিল্পী। তাকে মিউজিক স্কুলে নিয়ে যান।

এরপরের কাহিনী বলার সময় গিলিয়ানকে স্মৃতিকাতর দেখায়। সে বলতে থাকে, আমাকে মিউজিক স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কেউই তার নিজের জায়গায় স্থির থাকে না। সবাই নাচে, গান গায়,আঁকে। সবাই সবকিছুই করে।

এখন আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নতুন একটি হিউম্যান ইকোলজিকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। যদিও আমরা হয়তো ভবিষ্যতকে দেখবো না, কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে। তাই সেভাবেই আমাদের সৃজনশীলতাকে লালন-পালন এবং চর্চা করতে হবে। হয়তো এভাবেই একদিন পৃথিবী নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি পাবে। ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো-য় প্রকাশিত অনুবাদ

এই সময় ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

ভারত গত ১০-১৫ বছর ধরে উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাক্ষী, তা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখনও শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর মানুষ দারিদ্র দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন। অনেক গ্রামীণ জেলা আছে যেখানে মাথা পিছু গৃহস্থলী উৎপাদন সারা দেশের গড়ে এক চতুর্থাংশ। জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে।

বেশিরভাগ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে শহরে, কিন্তু ভাবতে হবে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিক ভৌগোলিক অবস্থা বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন জনজাতির অবস্থানও প্রধানত গ্রামে। তাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, ভাষা, কৃষি, খাদ্যাভ্যাস জীবনযাপন আলাদা আলাদা, পেশা, ভাষাগত চাহিদা, তাদের আশা-আকাঙ্খা আলাদা আলাদা। এই সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের জয়ধ্বজা কতদিন উড়তে থাকবে তা একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়ে তথাকথিত উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। কেন এমন হলো? শিক্ষাব্যবস্থার দিকে যদি একটু আলোকপাত করা যায়, তাহলে হয়তো কিছুটা এর হদিস পেতে পারি।

আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই শহরকেন্দ্রিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হবে যা গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করবে। যেটা হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা, সমৃদ্ধ করা এবং এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে নবীকরণের মধ্যে দিয়ে একটা দিশা দেওয়া, তারা যাতে ব্যবহারিক জীবনযাপন ভালো ভাবে করতে পারে। অথচ সংবিধানে সিডিউল ৭৩ তম সংশোধনের ১১ তম ধারার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্তরে গ্রামীণ শিক্ষাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানকে। এই শিক্ষাব্যবস্থার দেখভাল করার দায়িত্বও গ্রাম পঞ্চায়েতের। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে, এর জন্য দায়ী কে? আর এটা জানতে হলে আমাদের একটু অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

ইতিহাসে দেখা যায় ১৮৩৫ সালে বড়লাট বেন্টিঙ্ক, মিঃ

উইলিয়াম অ্যাডামকে স্পেশাল কমিশনের পদ দিয়ে বাংলা এবং বিহারের প্রাথমিক শিক্ষার একটি সমীক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ৩ বছর ধরে অ্যাডাম বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, দেখেন যে, সে সময় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের প্রতি ৩১টি বালকের জন্য একটি করে পাঠশালা ছিল। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ তিনটি জেলায় লোকসংখ্যার জন্য ১০৯৮টি বাংলা স্কুল ও ১০টি হিন্দী স্কুল ছিল, অর্থাৎ সে সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ১১০৮টি দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত। ৪ বছর বয়সে তাদের শিক্ষা শুরু হত এবং ১৪ বছর বয়সে তা শেষ হত। শিক্ষার খরচও ছিল কম; সব ধর্মের ও বর্ণের শিশুদের জন্য ছিল পাঠশালায় অবারিত দ্বার।

১৮৩৮ সালে তিনি একটা বিশদ রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং কয়েকটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলি ছিল:

১. দেশজ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের মান উন্নয়ন প্রয়োজন;
২. শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শক নিয়োগ;
৩. যে সব গুরুমশাই ভালো পড়াবেন তাঁদের পুরস্কার ও অনুদান প্রদান;
৪. ভালো গুরুমশাইদের ভরণপোষণের জন্য গ্রামে জমি প্রদান;
৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য জেলায় একটি করে নর্মাল স্কুল প্রবর্তন;
৬. পাঠ্যবই প্রণয়ন ও বিতরণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ;
৭. নির্ধারিত জেলায় শিক্ষকতার মান, বিদ্যালয়ের অবস্থা, পড়ুয়াদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা চালানো।

তৎকালীন সরকার অবশ্য টাকার অভাবে সুপারিশগুলি মেনে নেননি। কিন্তু সে সময়কার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মেকলে সাহেব (Thomas Babington Macaulay), অ্যাডামের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। বড়লাট বেন্টিংক-ই মেকলেকে শিক্ষার উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণ কমিটির মাথায় বসিয়েছিলেন। মেকলে সাহেব একটা প্রতিবেদন দাখিল করেন। এটাই "মেকলের মিনিটস" (Macaulay's Minutes on Indian Education) বলে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তাতে ছিলঃ

১. আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে ইংরেজ শাসক ও লক্ষ লক্ষ শাসিত প্রজাদের মধ্যে যোগসূত্র, দোভাষী গড়ে তোলার জন্য একটি শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হয়;
২. এরা হবে রঙে ও রক্তে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, বুদ্ধিতে, নৈতিকতায় ইংরেজ;
৩. ভারতীয় মানসিকতা ইংরেজ রীতিনীতির মাধ্যমে প্রসার লাভ করবে।

অ্যাডাম এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। এতে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা করা হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন -

- হিন্দু ও মুসলমানেরা বৃটিশ শাসনের পূর্বেও ছিলেন এখনও আছেন। নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার বাইরে থেকেই তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানস গঠন করে আসছে।
- একথা ভুললে চলবে না হিন্দুরা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্য জাতিদের মধ্যে অন্যতম।
- আমরা কি এই সু-প্রাচীন শিক্ষা সবই বর্জন করব?

মনে রাখতে হবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন গড়ে ওঠার আগে সমাজ থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞ যোগ্যরাই বসেছেন শিক্ষার আসনে। বাংলার লোককথা, রূপকথা নিজস্ব কৃৎকৌশল শিখিয়ে যাচ্ছেন বংশপরম্পরায়। সেটাকে নষ্ট করে তার ধ্বংসস্তূপের উপরই গড়ে উঠল ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক সময়ের শিক্ষাধারা। এই শিক্ষাধারা যেদিকে ধাবিত হচ্ছে তাতে বেশিরভাগ গ্রামের যুবক যুবতীরা শহরের পথে পা বাড়াচ্ছে। কারণ তারা যা শিখতে চায়, জানতে চায় এই শিক্ষা পদ্ধতিতে সেটা নেই। ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্য পশ্চিমী ধাঁচে আধুনিক শিক্ষা চালু হয়ে ছিল। বা বলা চলে শহরকেন্দ্রিক শিল্প সমাজের দিকে তাকিয়েই বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। মেকলের কথাটা আরেকবার বলা দরকার সেটা হল "আমি বা আমরা কখনও এই দেশটিকে বশীভূত করতে পারবো না, যদি না এই ভারতীয় জাতির সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ভাঙ্গা যায়। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি ভারতীয়দের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর ইংরাজী শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করা হোক।" ভারতীয়রা যেন ভাবে ইংরেজদের শিক্ষানীতিই সর্বোত্তম শিক্ষানীতি এবং পরাধীনতাকেই যেন ভারতীয়রা স্বাধীনতা বলে ভাবে এবং ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয় তাদের। স্বাধীনতার পর যখন শিক্ষা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলো তা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের আওতায় এলো। সেদিন থেকে একটা সংগ্রাম শুরু হলো আত্মশিক্ষার ধারাটা তাহলে কি হবে? সরকার শিক্ষা খাতে যে টাকাটা বরাদ্দ করছে সেটা হচ্ছে পরিকাঠামো গত চাহিদা থেকে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব করুণ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সরকারী শিক্ষা পরিসংখ্যান রির্পোট থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা -

. ৩৮% স্কুলছুট হয় ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর মধ্যে,
. ৬২% স্কুলছুট ক্লাস ১ম থেকে ৭ম শ্রেণীর মধ্যে এবং
. ৭৫% এর বেশী স্কুলছুট ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী অবধি।

এই পরিসংখ্যানটি নেওয়া হয়েছে ২০১১ বার্ষিক গ্রামীণ শিক্ষার প্রতিবেদন থেকে। এর থেকেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বর্তমান শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার সন্ধানে

"আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশাই"- রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকে অমলের সংলাপ থেকে মনে পড়েছে বর্তমান শিক্ষা কেবল পণ্ডিত হওয়ার জন্য, প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য নয়। মানুষ পড়াশোনা করে কেন? শুধু কি চাকরি পাবার জন্য? আর কি কোন লক্ষ্য নেই? যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁদের জীবনী যদি আমরা ভালো ভাবে পড়ি, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করি, তবে আমরা শিক্ষার ভূমিকাটা কি বুঝতে পারবো। মনীষীগণ তাঁদের নানা উপদেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবন সম্পর্কে নানান কথা বলেছেন। মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে গেছেন, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সে পথ বন্ধ, তাঁদের সেই সমস্ত রচনা আজ বইয়ের পাতাতেই আটকে আছে; আজকের যুগে, আজকের সমাজে তার কোন মূল্যই কেউ দেয় না। বর্তমানে শিক্ষা বলতে বোঝায় পুঁথিগত বিদ্যা। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তারা আশেপাশের মানুষকে ভালবাসতে শিখছে না। শিক্ষা কি কেবল পরীক্ষায় পাশ করা, ভাল নম্বর পাওয়া? সবাই হয়তো বলবেন, অনেকেই তো এই ভাবে পড়াশোনা করেই বড় হচ্ছেন। পাঠ শেষ করে চাকরিও পাচ্ছেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের জীবনদর্শনটা হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে সময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে জানবার, তাঁকে বোঝবার যে শিক্ষা সম্বন্ধে কি তাঁর দর্শন ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ডিগ্রী লাভান্তে চাকুরি লাভের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োগ নয়। ব্যবহারিক জীবনের জন্য শিক্ষার দরকার। প্রচলিত শিক্ষা নীতিতে চিত্ত বা অন্তর সংস্কার হয় না। শিক্ষার দুটি ধারা আছে। যার প্রথমটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের, দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক। মনুষ্যত্বের বিকাশ, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা এগুলি স্থান পায় প্রথমটির মধ্যে, আর জীবিকা প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি দ্বিতীয়টিতে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে সে শিক্ষাই হওয়া উচিত যা সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য, আনন্দের জন্য, ঢাক পিটানো শব্দের ডিগ্রী দেওয়া নয়। শিশু ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "শিক্ষার দ্বারা মানুষের ভেতর থেকে ইতরতার বিষ-বীজ দূর করার জন্য প্রয়োজন" মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন, তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। মানুষের জীবনের বরণীয়টুকুর সঙ্গে মানুষের আনন্দময় পরিচয় সাধন তখনই সম্ভব যখন শিক্ষা শিক্ষার্থীর সুপ্ত নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন যা হবে ছাত্রদের সহজবোধ্য, উৎসাহব্যঞ্জক, হৃদয়স্পর্শী, জলচর জলে সাঁতার দিলে যেমন টের পাওয়া যায় না, তেমনই হবে শিক্ষাপ্রণালী। আমাদের দেশ এক বিচিত্র দেশ। এখানে শিক্ষা নিয়ে কমিশনের পর কমিশন হয়, বিল হয়, আইন হয়, তবু শিক্ষা তেমন গভীরতা পায় না ও প্রসারতা পায় না, চেতনাহীন হয়ে পড়ে। শিশু ও কিশোরের মধ্যে প্রতিভার সলতে আছে তাকে প্রজ্বলিত করে শিক্ষার লোডশেডিং-এ দীপাবলি পালন করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজ জ্ঞানের পথে কঠিন বাধা, খাঁচার পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায় কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না।

> "খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে-এই রকম শিক্ষা চাই।"
> - স্বামী বিবেকানন্দ

শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "শিশুদের কাছে বিশ্ব খুব কাছে আছে। আমরা বয়স্করা সে কথা ভুলে যাই। এর জন্য কিছু নিয়মশৃঙ্খলার ছাঁচে তোলবার জন্য যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজেরা অভ্যাস দোষে বুঝতেই পারি না। বিশ্বের প্রতি তার একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর বোঝা যায়।" আমরা আওড়ে চলি শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আনে বিপব। কিন্তু কোথায় চেতনা, কোথায় বিপ্লব! বর্তমান শিক্ষার ফলে মানুষ শিক্ষার নিচে চাপা পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- সেটাকে কোন মতে মঙ্গল বলতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব - ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, মাষ্টারমশাইদের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলিয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সাহস করিলাম কই, আমরা রাজনীতিকে, অর্থনীতিকে নিজের স্বাধীন গবেষণা দ্বারা যাচাই করলাম কোথায়। আমরা কেবল

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

> আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তারা আশেপাশের মানুষকে ভালবাসতে শিখছে না। শিক্ষা কি কেবল পরীক্ষায় পাশ করা, ভাল নম্বর পাওয়া?

হায়! শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জিত না হই, এমনকী, আমরা ভুল করিলেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। সব শেষে যেটা বলা দরকার, সেটা হচ্ছে দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। লোককথা, লোকগান, পালাগান, কীর্তন, যাত্রা এসবের মধ্যে দিয়ে মানুষ নানাভাবে শিক্ষালাভ করে এসেছে। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষা যদি গ্রামের মানুষের মনের

খোরাক যোগাতে পারে তবেই প্রকৃত শিক্ষা হয়ে উঠবে। না হলে মানুষ হবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কলের মানুষ, অর্থাৎ যন্ত্রমানুষ যা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্য থেকেই খুঁজে বার করা দরকার, সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের জীবন যেমনভাবে যাপন করে সেখান থেকেই তারা খুঁজে পায় তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কোন দার্শনিক বা তাত্ত্বিকের হাত ধরে পায় না। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা হল ব্যক্তির সামাজিকীকরণের এক জরুরী দিক। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ সমভাবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করতে হবে। মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে তোলারই এক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা, আর সেই লক্ষ্যে এগিয়ে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা সামাজিক দুর্গতির দিকে নজর দেয়। চিকিৎসকের দায়িত্ব যদি হয় অসুস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় এবং রাজনীতিবিদদের দায় যদি হয় গোষ্ঠীর সমাজ শরীরের সুঠাম ব্যবস্থাপনা, তাহলে শিক্ষককেও সমাজের চিকিৎসাবিদ হিসাবেই দেখতে হবে। কিন্তু চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদদের প্রধান কাজ হল রোগের প্রতিকার আর শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতভাবে প্রতিষেধকের। ডাক্তারবাবু ও রাজনীতি বিশারদদের কাজ হল বর্তমান নিয়ে সমস্যা যেমন যেমন দেখা দিচ্ছে, তেমন তেমন তার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাদাতার চোখ ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, সমস্যা ও সংকট যাতে আদৌ দেখা না দেয় তার জন্যই তাঁকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই হল প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত মানবিক শিক্ষার সন্ধান, এরই সন্ধানে আমাদের প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকতে হবে।

> শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জিত না হই, এমনকী, আমরা ভুল করিলেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। .....

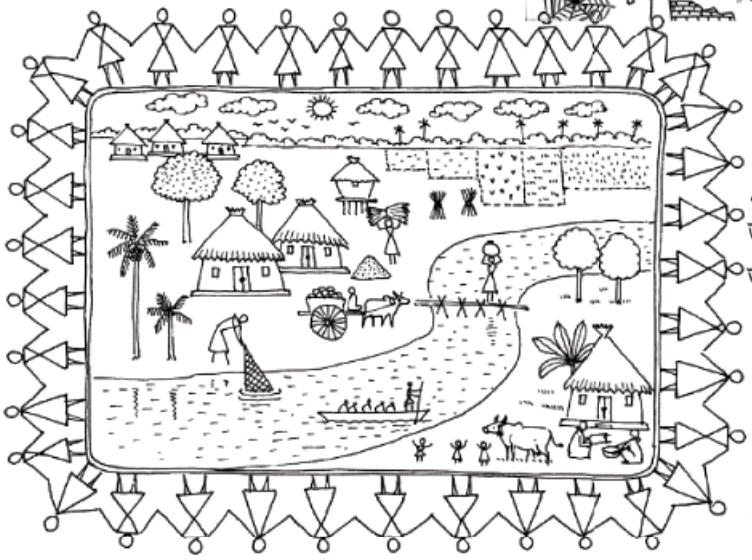

..... কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।

_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

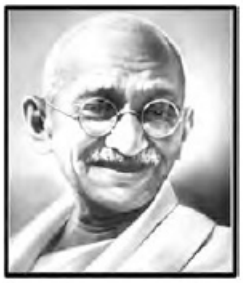

নঈ তালিম এবং গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা

আজ যদি আমরা গ্রামের কোনও স্কুলে গিয়ে বলি 'চলো আমরা স্কুলের সিলেবাসের পাশাপাশি ঘুঙরু শূকর, গারল ভেড়া, আর.আই.আর. মুরগী, খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস ইত্যাদি পালন করি'-অনেকে হয়তো রাগ করবেন বা বিরক্ত হবেন। খুব স্বাভাবিক, এসব কাজ করবো না বলেই তো স্কুলে এসেছি। কেননা এই শরীর-মন দিয়ে তৈরী হওয়া জীবিকাগুলি শুধু জটিল তাই নয় এর মধ্যে 'সম্মান'ও যেন বেশ কিছুটা কম। তাহলে আমাদের কাছে সম্মানজনক কি? আমাদের চিন্তায় – ধারণায় – মতাদর্শে যা শয়নে স্বপনে জাগরণে প্রতিনিয়ত ঘুরে ফিরে আসে তা হলো একটা সুন্দর, ছিমছাম, নিরুপদ্রব 'চাকরি'। এর জন্যই তৈরী হয়েছে বিদ্যালয়, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের দেশে ইংরেজরা এই বিদ্যালয়সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই। সিলেবাস, পঠন – পাঠন সমস্তকিছু খুব ভালো 'চাকুরে' হয়ে ওঠার জন্যই নির্মিত। এসবের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিলো একটার পর একটা বশংবদ প্রজন্ম।

এই অচলায়তনে যিনি বা যাঁরা প্রথম কুঠারাঘাত করেন তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁরা আমাদের খুব ভালো ভাবে বুঝিয়ে ছিলেন এবং নিজেরা করে দেখিয়ে ছিলেন কিভাবে দেশের এবং গ্রাম-ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ হতে পারে। তাঁরা দুজনেই বলেছেন এই সমস্ত উদ্যোগ স্বরাজ আন্দোলনের বাইরে নয়।

আমাদের আজকের আলোচনা যা নিয়ে তা আমরা শিরো নামে যদিও মুখ্যত স্পষ্ট করে দিয়েছি, তবু বলতে হবে যে আমরা এই লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, গান্ধীজীর 'নঈ তালিম' ভাবনার মূল প্রবেশ এবং প্রস্থান বিন্দুগুলি, আমরা দেখবো ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে এর সম্পর্কগুলি ঠিক কি ধরণের ছিল।

গান্ধীজী মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন একজন মানুষ যিনি নিজের রাজনীতি, মতাদর্শ-কে বারে বারে প্রশ্ন করেছেন, পথ পরিবর্তন করেছেন এবং মতাদর্শ-কে সূত্রায়িত করেছেন বিনা দ্বিধায়। আজ আমরা যদি চারদিকে তাকাই সেখানে কি দেখবো? সবাই লেখাপড়া করছে শুধু বস্তুগত প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য। অথচ গ্রামে যে পঞ্চায়েত রয়েছে সেখানে যে রক্তজল করা পরিশ্রমে দিনরাত কাজ করে চলেছে একদল মানুষ, তাদের সম্পর্কে যদি গ্রামের হাইস্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের মতামত চাওয়া হয় তারা বলবে সে তো দুর্নীতির আখড়া। কিন্তু যদি তারা জানতো পঞ্চায়েত এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহলে হয়তো পঞ্চায়েতগুলি হয়ে উঠতো শিক্ষার অন্যতম উৎস। যে কারণে গ্রামে যদি গবাদি পশুর মৃত্যু হয় তার কোন হেলদোল বিদ্যালয়ে বা তার ছাত্র-শিক্ষক সমাজে দেখা যায় না। গান্ধিজীর 'নঈ তালিম' এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে একটা মূর্ত প্রতিবাদ।

আসুন একটা 'Fantasy' দিয়ে শুরু করি। বাঁকুড়া পুরুলিয়া সীমান্তের একটি আপার-প্রাইমারী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ৮টি ক্লাস অথচ তিনটি ঘর। শিক্ষক দুজন, যখন জিজ্ঞেস করা হল এতে অসুবিধা হয় না? প্রধান শিক্ষক বললেন অসুবিধা? ঘর নেই বলে? না! বাইরে যে অনন্ত প্রকৃতি সেটাই তো আসল ক্লাস। এখানে সকালবেলায় প্রতিদিন একেকটি ক্লাস এর ছেলেমেয়েরা যায় স্থানীয় গ্রামের পরিবারে, সেখানে গিয়ে হাঁস-মুরগী-গরু-শূকর-খরগোশ এর পরিচর্চায় তারা সহায়তা করে। মাঝে মাঝে সেখানেই শুরু হয় জলজ প্রাণীসম্পদ নিয়ে শিক্ষা। দুপুরে যখন স্থানীয় স্ব-নির্ভর দলের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত রসুই ঘরে চলে ভোজের প্রস্তুতি, সেখানেও পালা করে উপস্থিত হয় ছাত্র ছাত্রীরা। সেখানে তারা শেখে রান্নায় নুন – তেলের সংযমী ব্যবহার, আলু-পটল কাটার পদ্ধতি। এগুলোই তো জীবনকুশলতা বা 'LifeStyle' যা গ্রামের জীবনযাপনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অনেকে ভাবছেন এই 'Fantasy' দিয়ে আমরা আসলে বলতে চাইছি কি? আমরা বুঝে নিতে চাইছি গান্ধীজীর 'নঈ তালিম' ভাবনার প্রধান সূত্রটি। তাকেই, অর্থাৎ সেই শিক্ষাই তার কাছে 'নঈ' অর্থাৎ নতুন শিক্ষা, যা স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, যা উৎপাদনশীল শ্রম-কে উৎসাহিত করে, গ্রামে থাকার এবং বাঁধার মতো কুশলতা সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি গ্রামস্বরাজকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

অনেকের ধারণা আছে যে ১৯৩৭ সালের ওয়ার্ধা সম্মেলনের সময়েই বোধহয় গান্ধীজী শিক্ষা নিয়ে তার মতামত রাখেন, তা নয়। তিনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তলস্তয় ফার্ম-এর সাথে কাজ করছেন সেখানেই পল্লবিত হয়েছিল তাঁর নতুন শিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবনাগুলি। এই সব ভাবনাগুলি তিনি বিভিন্ন সময় যেভাবে লিখেছেন এবং বলেছেন সেখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় তার 'নঈ তালিম' এর তত্ত্ব। এর মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে তবে বলা যেতে পারে এ হলো অনেকগুলি উপাদানের একটি সংমিশ্রণ –

প্রথমতঃ নতুন শিক্ষা হবে দেশের মানুষের সংস্কৃতি এবং জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও তার মধ্যে প্রোথিত।

দ্বিতীয়তঃ এর প্রধান লক্ষ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন করা।

তৃতীয়তঃ শুধু পাঠ্যবই-নির্ভর শিক্ষা নয়।

চতুর্থতঃ শিক্ষাকে হতে হবে পুরোপুরি ভাবে স্ব-নির্ভর।

পঞ্চমতঃ এই নতুন শিক্ষা যত্নবান হবে পড়ুয়ার সার্বিক বিকাশের জন্য।

ষষ্ঠতঃ এই শিক্ষা হবে পুরোপুরি ভাবে হাতের কাজ-কেন্দ্রিক।

এগুলি গান্ধীজী হঠাৎ একদিন বসে ভেবে তৈরী করেননি।

এগুলি তিনি চলার পথে কখনো 'হিন্দ স্বরাজ' বা কখনো 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে ছিলেন।

গান্ধীজী ইভান ইলিচের অনেক পূর্বেই নির্বিদ্যালয়করণ বা de schooling – এর কথা বলে গিয়েছেন। তিনি আমাদের দেশের সেই বিরল শিক্ষা দার্শনিকদের অন্যতম, যিনি শিক্ষাকে ভাবতে পেরেছিলেন তথাকথিত শিক্ষালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে। যে কারণে শিক্ষাকে যখন বাধ্যতামূলক করা হয়, তখন তিনি তা মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

এবারে আমরা একটু দেখবো 'নঈ তালিম' – এর প্রধান সূত্রগুলির ব্যাখ্যা কি ধরণের হতে পারে। তিনি খুব দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেছেন যে পাঠক্রম এবং শিখন প্রণালী পরাধীন ভারতে প্রবহমান ছিলো, তা শুধু আমদানীকৃত। তাই নয়, বরঞ্চ তা বহু সময় দেশ এবং জাতির স্বার্থের পরিপন্থী। এখানে যে শিক্ষা 'বিতরণ' করা হয় তা শুধু মাত্র কৃত্রিমতা দিয়ে ভরা তাই-ই নয়, সেখানে এমন অনেক উপাদান বিদ্যমান যা আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এর পাশাপাশি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়াটি- মুক্তমন, মুক্তমেধা, মুক্তবুদ্ধির জন্য দরকার গুণমান সম্বলিত শিক্ষা – এটা ঠিক আজকের IIT – IIM থেকে নিঃসৃত কথা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না। আজ যখন 'Quality Education'-এর কথা কেউ বলে সেখানে ৯০% ক্ষেত্রে বোঝাতে চাওয়া হয় বর্তমান বাজারের সাথে সেই শিক্ষা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানেই গান্ধিজীর সার্থকতা। তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন সেই বিশেষ মতাদর্শ যেখানে শিক্ষা হবে বাজার নয়, গ্রামমুখী।

বিগত শতাব্দীর প্রধানত দুই এবং তিনের দশকের এই সব ভাবনাগুলি গান্ধিজী তুলে ধরেছিলেন ওয়ার্ধা সম্মেলনে। আর তারপর তাঁর ভাবনা অনুযায়ী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি খোলা হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে চরকা, গ্রামীণ হাতের কাজ ইত্যাদির ওপরে প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে এই ধরণের বিদ্যাচর্চা সেদিনের ভারতবর্ষে খুব যে জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এমন নয়। সেগুলি তখন অনেকটাই প্রান্তিক নিরীক্ষা হিসেব থেকে যায়। তবে আমাদের ভাবতে ভালো লাগে, যে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মার শিক্ষাদর্শনের পার্থক্য এই সময় অনেকটাই ঘুচে গিয়েছিলো।

তবু আজ সময় হয়েছে মহাত্মার দর্শন নতুন করে বোঝার।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষা ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই এটা বলতে হয় যে তাঁদের দুজনেরই শিক্ষাভাবনা ছিল তাঁদের নিজস্ব একটা দর্শন, যা আজও অনেকাংশেই প্রাসঙ্গিক। সময় বদলানোর সাথে সাথে শিক্ষা নিয়ে নানান আলোচনা এবং চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা নিয়ে নানান মহলে গবেষণা চলতেই থাকে। ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতি এই গবেষণার জোয়ারে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নবদিশা সবসময় আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপর জোর দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করে থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা যা আজও প্রাসঙ্গিকতা দাবি করে, পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে তা দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যখন শিক্ষার সূচনা ঘটে তখন ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষা পরিব্যাপ্ত। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষাধারা মেকলে'র মডেলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার সূচনা। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ১৮৭৭ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তসারশূন্যতা তাঁর কাছে প্রথমেই ধরা পড়ে। শৈশবেই তার মনে হয়েছিল এ শিক্ষা প্রাণহীন এবং যান্ত্রিক। তিনি একে "কলের শিক্ষা" আখ্যা দিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা তাঁর "শিক্ষার হেরফের" লেখাটিতে আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেন-"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়— এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি,একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে। তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে

কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই। য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র। এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে। কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপমা-ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না। পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম-শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না। অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।" রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা ভাবনাকে চারিত করে ছিলেন, তেমনি গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা ভাবনা ও শিক্ষা সাধনার উদ্যোগ নেন মূলত সবরমতী বা সেবাগ্রামে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গান্ধীজির আন্দোলনের ফলে দেশের কোনো কোনো স্থানে তাঁর সবরমতী সেবাগ্রামের আদর্শে কিছু আশ্রম গড়ে ওঠে। এই সমস্ত স্থানেও গান্ধীজির শিক্ষা দর্শনের মডেলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মূলত মডেলটি ছিল "নঈ তালিম" বা বুনিয়াদি শিক্ষা যার কিছুটা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গান্ধীজির মতে ব্রিটিশদের তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল "গোলাম তৈরির কারখানা"। তাঁর কথায় বলতে গেলে "আমরা কেবলমাত্র ইংরাজদের শিক্ষা গ্রহণ করে জাতি ও দেশকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছি। অসততা এবং অত্যাচার বেড়েছে। ইংরাজী জানা ভারতীয়রা সাধারণ মানুষকে ঠকাতে বা ভয় দেখাতে ইতস্তত করে না"। গান্ধীজির শিক্ষা ভাবনা ছিল নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা, যা প্রতিটি শিশুর জন্য সাত বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। সাত বছরের এই শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদনমূলক শরীর শ্রমকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে। আর সেই শারীরিক শ্রম হবে শিশুর আঞ্চলিক পরিবেশ নির্ভর অর্থাৎ কৃষি, বৃক্ষরোপণ ও পালন, পশুপালন , সুতোকাটা, কাপড় বোনা ও তার রং ছাপায়ের কাজ এবং গ্রামের উৎপন্ন শস্য ও ফল সব্জিকে আহারের উপযুক্ত করার কাজ, ধান ভাঙা, আটাপেষাই, কামার, কুমোর, ছুতোরের কাজ, কাগজ তৈরি, মৌমাছি পালন ইত্যাদি যে গুলি গ্রামের প্রচলিত বৃত্তিমুলক শিক্ষা মধ্যেই পড়ে।

মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সামাজিক মানুষ হিসেবে বিকশিত করার সুযোগ করে নিতে না শেখায় তা হলে তা হবে নিরর্থক।

গ্রামের এক মূর্খ ধনী লোক শহর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথিমধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন একটি বড় বিল্ডিং। কৌতূহলবশত সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এটা কী? কর্তব্যরত কর্মকর্তা বললেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়। পাল্টা প্রশ্ন, এখানে কী করা হয়? তিনি বললেন, এখানে ডিগ্রি দেওয়া হয়। তাঁর ডিগ্রি নেয়ার শখ হলো, তাই তিনি বললেন, আমাকে একটি দেওয়া যাবে ? তিনি বললেন, ১০০ ডলার লাগবে। তিনি ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পথে চিন্তা করলেন তার ঘোড়ার জন্যও একটি ডিগ্রি নেয়া দরকার। তাই তিনি গিয়ে বললেন, ভাই আমার ঘোড়াটার জন্য আরেকটি ডিগ্রি দেন । কর্মকর্তা বললেন, এখানে শুধু গাধাদের ডিগ্রি দেওয়া হয়, ঘোড়াদের নয়।

আদর্শ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

- স্বপন কুমার ঘোষ

কবি বললেই ভাবকল্পনায় উদ্দীপিত এক মানুষকে বোঝায়। আবার কবি ভাবলেই এক নিমগ্ন কল্পনাসেবী-কে মনে পড়ে। শিক্ষক বললেই মনে ভাসে শিক্ষাদানে আগ্রহী, ছাত্রচেতন জনৈক ব্যক্তিত্বকে। অনেক কবি কল্পনা করতে পারেন, অনেক সময় ছাত্রদের বোঝাতে পারেন না। কবি কি শিক্ষক হতে পারেন ? শিক্ষক কি কবি ? হ্যাঁ, দুয়েরই উদাহারণ দেওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালায়া
রাবিন্দ্রানাথ ক্লাস নিচ্ছেন

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিরল প্রতিভার একজন। যিনি একাধারে রচয়িতা, স্রষ্টা, আবার অন্যদিকে প্রজ্ঞাপ্রসারী আদর্শ শিক্ষক। কবি-শিক্ষকদের যে দুর্লভ ঐতিহ্য সারা পৃথিবীতে আছে, নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-কে পাওয়া যে কোনো মানুষের জীবনে এক দুর্লভ, বিরল, অনিন্দ্যকান্তি অভিজ্ঞতা।

জীবনবৃত্তান্ত সূত্রে সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রচলিত শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে কবির বিদ্রোহী সত্তা মুক্তি চাইছিল নাগরিক জীবনে গৃহগত বন্দিত্ব থেকে। সে কারণে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি দেখেছেন খন্ডিত, অসম্পূর্ণতা। এসব তাঁর কাছে বিরস মনে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রভাবনা ছিল, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানবমনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাভাবিক বিকাশ। ছাত্রদের জীবনকে বিকশিত করবার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিচিত্র সাহচর্য – রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনার অন্যতম কথা।

ওপার বাংলায় কবি যখন জমিদারির সব কাজকর্ম দেখছিলেন, সে সময় প্রকৃতি-ই চারদিক থেকে মুক্ত পরিবেশের আহ্বান জানিয়েছিল তাঁকে, কবি-ও সেই আহ্বানে আন্তরিক ভাবেই সাড়া দিয়েছিলেন। কলকাতার যান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে শুধু অন্য বাড়ির ছেলেদের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি সন্তানকেও তাঁদের জমিদারি শিলাইদহের 'গৃহবিদ্যালয়ে' সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। শিলাইদহে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার বিষয়ে তাঁর সরাসরি প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, একথা বলা যেতে পারে।

শিলাইদহে পতিসরের পল্লী অঞ্চলের জমিদারি পরিচালনার কাজে বিভিন্ন দিকে ব্যস্ত থেকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এখানে গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষাদানের চেষ্টা হলেও এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সামগ্রিক ও যথার্থ হয়ে উঠতে পারবে না।

সেকারণে তাঁর বিদ্যালয় - ভাবনা ও শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী কবি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার কথা অন্তর থেকে ভাবছিলেন। সেটি হবে এদেশে নতুন ছাত্রদের মনোবিকাশের উপযোগী। তিনি সেইসময় থেকেই শিলাইদহের এই গৃহ বিদ্যালয়টিকে সমাজের আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশদভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন।

'সব পেয়েছির দেশ' শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল রবীন্দ্র শিক্ষা-স্বপ্নের একটি আদর্শকর্মক্ষেত্র। শান্তিনিকেতন – আশ্রমের নির্জন নিভৃত পরিবেশে প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শে সীমাহীন আনন্দের স্রোতের শিক্ষা যাতে উদার মনোভাব গঠনে সহায়ক হয়, তার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ তাঁর মনে বেশ তীব্র হয়ে উঠল। সময়টা তখন স্বদেশীর যুগ। ইংরেজি স্কুলের পরিবর্তে একটি স্বদেশী ধাঁচের বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জরুরী প্রয়োজন ও আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আর এর সঙ্গে তাঁর ভাবনাবৃত্তে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বয়ের পাঠ্য ও অন্যান্য চারুকলা শিক্ষার ভাবাদর্শ। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আকাশ ভরা কোলে ছাত্ররা হয়ে উঠুক 'পূর্ণ মানুষ'।

আদর্শ শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষা সংগঠক রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তৈরি প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে – শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। ১৯০১ সালের বাইশে ডিসেম্বর, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের সাতই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরের সাংবাৎসরিক উপাসনা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বাল্য জীবনের শিক্ষার 'অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত'। কবির কথায় – 'মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত'। সেকারণে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ 'মাস্টার' নির্বাচন করবার ক্ষেত্রে সব সময় ছিলেন সচেতন। কবির শিক্ষকতা জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি শিক্ষক চিনতে ভুল করেননি। তাঁর শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল – প্রকৃতি।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে পঠন–পাঠন ও পরিচালনার কাজে কয়েকজন আদর্শবাদী শিক্ষক-কে নিকট-সঙ্গী ও সহকারী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, রেবাচাঁদ (অনিমানন্দ) প্রমুখদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতন। হয়তো এঁরা কেউই পেশায় শিক্ষক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা আর বিশাল অনুরাগ। বলতে গেলে, একমাত্র কবির টানেই তাঁরা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সব নিষ্ঠাবান এবং আদর্শবাদী শিক্ষকমণ্ডলী

গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি আবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের কথা ভেবেই ছাত্রদের পড়াবার জন্যে নিজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলায় নতুন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-র, সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুটি খন্ডে একটি সংস্কৃত বই লেখেন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে 'সংস্কৃত প্রবেশ' বই রচনা করেন। যে-সময় শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তখন দেশে ইংরেজি পাঠ দেওয়ার উপাদান খুব একটা বেশি ছিল না। কবির পক্ষে সংগ্রহ করাও কঠিন ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ডিরেকট মেথড বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়াবার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

১৯০৪ সালের মে মাসে কবির লেখা 'ইংরেজি সোপান'-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এর দু'বছর বাদে ১৯০৬ সালের জুন মাসে এই বইটির দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ পায়। 'ইংরেজি সোপান' বইটি প্রকাশিত হবার পর কোচবিহার থেকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথ-কে লেখা এক চিঠিতে বই সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় কবির এই প্রচেষ্টাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।

'ইংরেজি সোপান' গ্রন্থ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ কবি-কে লিখেছিলেন – "আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত – Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাপুস্তক প্রণেতাগন এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।"

তিনি ইংরাজি পাঠ লেখেন ১৯০৯ সালে। আঠারটি পাঠে সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে পঠন-পাঠন, রচনাকার্য আর অনুশীলনে নিয়মিতভাবে উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁদের লেখা বইয়ের নামকরণ করেছেন। যেমন, ১৯২২ সালে ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের নাম তিনিই রেখেছিলেন – 'ভূ-পরিচয়'।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন, নানান ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বিদ্যালয়ের ক্লাশ নিতেন। আর পড়ানোর ফাঁকে ছাত্রদের জন্য নতুন মজার খেলা আবিষ্কার করতেন, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চাও করাতেন। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পড়াতেন, সেকথা জানতে পারি কবি-কন্যা মীরাদেবী-র অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় 'স্মৃতিকথা' বইটিতে। মীরাদেবী লিখেছেন – "..... বেশির ভাগ সময় গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে বেছে বেছে কবিতা পড়াতন। আমি ভালো মুখস্থ করতে পারতুম না কিন্তু বাবা সুন্দর উপায়ে মুখস্থ করিয়ে দিতেন। যেখানটা আমার মনে পড়ত না সে জায়গার কবিতার ছবিটা মনে করিয়ে দিতেন, তখন আস্তে আস্তে সবটা মনে পড়ে যেত। যে কবিতাটি মুখস্থ করাতে চাইতেন সেটা বার কতক লিখতে বলতেন; লিখতে লিখতে আপনি মুখস্থ হয়ে যেত। ..... ক্রমে আমাকে টেনিসন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কবিতা, সোরাব ও রুস্তমের কাহিনী, তারপর এনক আর্ডেন ইত্যাদি ইংরেজি সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

আমরা প্রায় সকলেই একথা জানি যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে সাহিত্যের সঙ্গে বহুবিধ শিক্ষার পঠন-পাঠনের আয়োজন হয়েছিল সে-যুগে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেসময় বিভিন্ন ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব লেখা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সেই সব বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কবি নিজে 'মার্ক' করে জগদানন্দ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ছাত্রদের সেইসব লেখা জগদানন্দ বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন। শান্তিনিকেতনের সীমাহীন আকাশ পরিষ্কার থাকলে গৌরপ্রাঙ্গণে টেলিস্কোপের সাহায্যে জগদানন্দ রায় ছাত্রদের গ্রহ-নক্ষত্রদের সঙ্গে বিশদভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছাত্রদের গণিত শেখাবার বিষশদভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছাত্রদের গণিত শেখাবার বিষয়ে কবি তাঁকে নানাবিধ উপদেশ দিয়েছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষাদর্শের পথ প্রবর্তক। শিক্ষাকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন তা সারা পৃথিবীতে মুক্ত শিক্ষায় এক অনন্য পদ্ধতি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তথা শিক্ষকের ভূমিকা একান্ত অভিনব। যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা মুগ্ধ। তাঁরা সকলেই ভাষাকুলতায় একথা অকপটে জানিয়েছেন যে, এর কোনো তুলনা নেই। সাহিত্যের বিবরণে আকর্ষণীয় করে ছাত্রমনে তা গেঁথে দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর – যা সার্থক শিক্ষকের একটা গুণ। আর চলতে চলতে, গাইতে গাইতে খেলাচ্ছলে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ করে তুলেছিলেন ভারমুক্ত, আনন্দময় – যার দ্বিতীয় উদাহরণ আর নেই।

"যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু,
মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌-এর চোখে

ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র

১৮১৮ সালে স্কটল্যান্ডবাসী উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্‌ (১৭৯৬-১৮৮১) ভারতে তথা কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসাবে। সেখানেই তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শেখেন। অ্যাডাম্‌স্‌ রোজগারের পথ হিসাবে সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৩৫ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সরকারের নির্দেশে বাংলা ও বিহারের কিছু অংশে শিক্ষা নিয়ে সমীক্ষা করেন। EDUCATION IN BENGAL AND BEHAR শিরোনামে তিনটি পর্যায়ে সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটি এক অবিস্মরণীয় দলিল। ১৮৩৮সালে শেষ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান নিবন্ধের সমস্ত তথ্য ৩য় রিপোর্টটি থেকে সংকলিত। আমাদের আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা, যথা - মুর্শিদাবাদ,বীরভূম ও বর্ধমান-এর মধ্যে। মনে রাখতে হবে সে সময়ে জেলাগুলিতে সব থানায় সমীক্ষার কাজ হয় নি।

মুর্শিদাবাদ- এই জেলায় সেই সময় ৩৭টি থানার মধ্যে ২০টি থানায় সমীক্ষা হয়ে ছিল। এই থানাগুলোর আওতাধীন এলাকায় তিনি ৬টি ভাষার মোট ১১২টি এবং একটি মেয়েদের স্কুলের সন্ধান পান। বেশিরভাগ স্কুল ছিল বাংলা ভাষার,সব থানা মিলিয়ে ৬২টি। অন্যান্য ভাষার স্কুলগুলির মধ্যে ছিল - হিন্দি ৫টি, সংস্কৃত ২৪টি, পারসি ১৭টি, আরবী ২টি ও ইংরাজী ২টি। ৩টি থানা এলাকায় হিন্দি স্কুলগুলি গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে অ্যাডামস্‌ জানিয়েছেন যে, এসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের যেসব হিন্দিভাষী হিন্দুরা সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাস করছেন তাঁদের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে এগুলি গড়ে ওঠে। সংস্কৃত, পারসি, আরবী ও ইংরাজী ভাষার স্কুল গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে অ্যাডাম্‌স্‌-এর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায় নি। শিক্ষকদের সম্বন্ধে তাঁর পরিবেশিত তথ্যে দেখা গেছে স্কুলগুলি ছিল এক-শিক্ষক বিশিষ্ট। তিনি জাত-ভিত্তিক ৬৬ জন হিন্দু শিক্ষকের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল মোট ১০টি জাতের লোক ছিল। সংখ্যায় সবথেকে বেশি ছিল কায়স্থরা, ৩৯ জন। একটি বাংলা স্কুলে তিনি মুসলিম শিক্ষক দেখেছিলেন। অ্যাডাম্‌স্‌ বলেছেন, পড়তে, লিখতে ও অংক কষা শেখাতে কায়স্থরা ভালো পারে বলে মনে করা হত। অ্যাডাম্‌স্‌ আরো একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন, সমাজের উচ্চবর্গের মানুষজন তাঁদের শিশুদের নিম্নবর্গের বা এমনকী অন্য ধর্মের শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা করতেন না। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, উপরে উলিখিত মুসলিম শিক্ষকের স্কুলে ভালো সংখ্যক হিন্দু ছাত্র ছিল। চন্ডাল বা অন্য নিম্নবর্গের শিক্ষকদের স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। শিক্ষকদের মধ্যে নানা পেশারই লোক ছিল। তিনি চারজন শিক্ষককে চিহ্নিত করেছিলেন যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করতেন। এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন পারিবারিক পুরোহিত, একজন তাঁতী ও একজন খুচরো ব্যবসায়ী। একজন পুরোহিত সম্পর্কে অ্যাডাম্‌স্‌ বলেছেন, তিনি অভিভাবকদের কাছ থেকে মাসিক কোনও নির্দিষ্ট মাইনে নিতেন না, তবে দুর্গা পূজার সময় উপহার হিসাবে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজী ও রান্নার বাসন প্রভৃতি নিতেন। তাঁতী-শিক্ষকটিরও নির্দিষ্ট কোনও পারিশ্রমিক ছিল না, ছাত্ররা যা দিত তাই নিতেন। অ্যাডাম্‌স্‌ এমন শিক্ষকেরও সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা মাইনে নিতেন, কিন্তু ছাত্রদের অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন এবং এই ঘটনা তাঁকে বেশ মোহিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, স্থানীয় সমাজের সবথেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইসব অকৃত্রিম পরোপকারের ইচ্ছার ঘটনাগুলি উল্লেখ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি।

জেলার বেশীরভাগ শিক্ষক তাঁদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেতেন বিভিন্নভাবে। কয়েকজন মাসিক মাইনে পেতেন যা (সমাজের) কোনও একজন (বিশিষ্ট) ব্যক্তি দিয়ে দিতেন; অন্যেরা প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে মাসিক ভাতা পেতেন যার পরিমাণ ছিল এক আনা থেকে আট আনা; এবং অন্যেরা, যাঁদের মধ্যে কেউ মাহিনা বা ভাতা পেতেন আর কেউবা পেতেন না, উপরি (খারাপ অর্থে নয়) হিসাবে পেতেন চাল, ছাত্ররা যে যেমন দিতে পারত, খোরাকী হিসাবে পেতেন মাসে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে দু-তিন আনা বা সকলের মিলিয়ে দু-তিন টাকা, কেউ কেউ দুর্গা পূজার সময় পার্বণী হিসাবে পেতেন টাকা অথবা কাপড়চোপড়, যার মূল্য সব ছাত্রদের কাছ থেকে মিলিয়ে বছরে আট আনা থেকে চার-পাঁচ টাকার মধ্যে থাকত। অ্যাডাম্‌স্‌ তাঁর রিপোর্টে বাংলা ও হিন্দি স্কুলের ৬২ জন শিক্ষকের মোট মাসিক মাইনে যে হিসাব দিয়েছিলেন সেই অনুসারে গড়ে প্রতি শিক্ষকের মাসিক মাইনে ছিল চার টাকার মত। এরপর অ্যাডাম্‌স্‌ স্কুলবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কে রিপোর্টে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কখনও কখনও স্কুলবাড়ি শিক্ষকমশায় নিজেই তৈরী করে নিতেন; কখনও কখনও

অ্যাডাম্‌স্‌ তাঁর রিপোর্টে বাংলা ও হিন্দি স্কুলের ৬২ জন শিক্ষকের মোট মাসিক মাইনে যে হিসাব দিয়েছিলেন সেই অনুসারে গড়ে প্রতি শিক্ষকের মাসিক মাইনে ছিল চার টাকার মত।

অঞ্চলের তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি স্কুলবাড়ি তৈরীর খরচ দিতেন, যাঁর ছেলে ওই স্কুলে পড়ত; কখনও কখনও সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে স্কুলবাড়ি তৈরি হত। - শিক্ষক ও অভিভাবকরা কিছু অর্থ দিতেন, ছাত্ররা স্কুলবাড়ি নির্মাণে গায়েগতরে খাটত, পরোপকারী কোনও ব্যক্তি হয়ত জমি দান করতেন, তার সাথে অর্থ ও বাড়ি তৈরির মালমশলাও দিতেন। তবে অ্যাডাম্‌স এও জানিয়েছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি স্কুলের নিজস্ব বাড়ি দেখেন নি। সেসব ক্ষেত্রে স্কুল বসত কোন শিক্ষক বা কারও বাড়িতে, বা কোনও মন্দিরের দাওয়ায়, বা কোনও দোকানঘরের কোণে, বা মসজিদের চাতালে, অথবা কোনও গাছতলায়। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ৬৭টি স্কুলে মোট ছাত্র ছিল ১০৮০ জন, অর্থাৎ স্কুলপ্রতি গড়ে ১৬.১ জন। সমীক্ষা চলাকালীন তাদের গড় বয়স ছিল ১০.১ বছর। ৭৭৮ জন ছাত্রের স্কুলে ঢোকার সময় গড় বয়স হিসাব করা হয়েছিল ৬.০৩; আর স্কুল ছাড়বার আনুমানিক বয়স হিসাব করা হয়েছিল ১৬.৫ বছর। এই হিসাব থেকে স্পষ্ট ছাত্ররা প্রায় ১০ বছর স্কুলে কাটাত। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। তবে ছাত্রদের মধ্যে নিম্নবর্গের শিশুরাও সংখ্যায় খুব কম ছিল না। হিন্দু ছাত্রদের জাত বিভাজনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম্‌স মোট ৫০টি জাতের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল সকলেই ছিল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য শিক্ষার জগতে নিম্নবর্গের মানুষের জাগরণ ঘটেছে। সংস্কারের বেড়া টপকেএই নিঃশব্দ আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য অ্যাডাম্‌স অবশ্য শক্তপোক্ত বৃটিশ শাসনকেই বাহবা দিয়েছেন। কীভাবে লেখার অভ্যাস চলত তা নিয়ে অ্যাডাম্‌স লিখেছেনঃ লেখার ক্ষেত্রে চারটি ধাপ ছিল, প্রথম ধাপে ছাত্ররা মাটিতেই লেখা অভ্যাস করত, দ্বিতীয় ধাপে লেখার জন্য তালপাতা ও কাঠের বোর্ড ব্যবহার করা হত, তৃতীয় ধাপে পিতলের পাত ও একধরনের গাছের চ্যাটালো পাতা এবং চতুর্থ ধাপে কাগজ। লিখত চক ও নলখাগড়ার কলম দিয়ে।

> **শিক্ষক ও অভিভাবকরা কিছু অর্থ দিতেন, ছাত্ররা স্কুলবাড়ি নির্মাণে গায়েগতরে খাটত, পরোপকারী কোনও ব্যক্তি হয়ত জমি দান করতেন, তার সাথে অর্থ ও বাড়ি তৈরির মালমশলাও দিতেন।**

সবশেষে, স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে। ৪টি হিন্দি স্কুলে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক হিসাবনিকাশ, ১৪টি বাংলা স্কুলে কেবলমাত্র কৃষিকাজের হিসাব এবং ১০টি বাংলা স্কুলে বাণিজ্যিক ও কৃষি বিষয়ক হিসাব দুই-ই শেখানো হত, ৩টি স্কুলে, যার মধ্যে ১টি হিন্দি ও ২টি বাংলা লেখার কাজ মূলত মাতৃ ভাষায়, লেখানো ছাড়া বাণিজ্যিক ও কৃষি বিষয়ক হিসাব দুই-ই শেখানো হত। একমাত্র হিন্দি স্কুলটিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়ে লেখাপড়া হত। এই তথ্য থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে সেসময় শিশুদের পড়াবার মত হিন্দিতে ভালো কোন বই ছিল না। একটিমাত্র বাংলা স্কুলে "গুরু বন্দনা" শেখানো হত। এতে কোনও ছন্দ ছিলনা। ৩২টি স্কুলে শুভঙ্করি নিয়মে অঙ্ক শেখানো হত। ৩টি স্কুলে ছন্দের বালাইহীন "গুরু দক্ষিণা" শেখানো হত, যা গেয়ে বয়স্ক ছাত্ররা শিক্ষকদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করত। একটা বাংলা স্কুলে মাতৃভাষার সাথে সাথে সামান্য সংস্কৃতও শেখানো হত। ১৪টি স্কুলে সংস্কৃতে চাণক্য শ্লোকও পড়ানো হত। এইসব স্কুলে মাতৃভাষা বা সংস্কৃত যা পড়ানো হত তা পান্ডুলিপি দেখে বা শিক্ষকদের স্মৃতি থেকে পড়ানো হত; কিন্তু ৫টি স্কুলে ছাপানো "শিশু বোধ" পড়ানো হত। তবে মনে রাখতে হবে বাংলায় তখন ছাপাখানার প্রথম যুগ, তাই স্বাভাবিকভাবেই ছাপার মান ভালো ছিল না। অ্যাডাম্‌স্ দুজন শিক্ষকের কথা উলেখ করেছেন যাঁদের কাছে তিনি সেই সময়কার ছাপানো স্কুলপাঠ্য বই দেখেছিলেন। **বীরভূমঃ** বীরভূম জেলার ১৭টি থানাতেই সমীক্ষা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত সবধরণের স্কুল মিলিয়ে মোট স্কুলের সংখ্যা ৫৪৪। অর্থাৎ থানা প্রতি ৩২টি। তিনটি থানাতে কেবলমাত্র মাতৃভাষায় স্কুল পাওয়া যায় এবং তা সংখ্যায় অন্য থানাগুলির তুলনায় খুবই কম। ৪১২টি মাতৃভাষায় বা দেশীয়ভাষার স্কুলের মধ্যে ৪০৭টিতে বাংলা এবং ৫টিতে হিন্দিতে পড়ালেখা হত। ৫টির মধ্যে একটিতে পুরোপুরি হিন্দিতে, বাকী ৪ টিতে হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে। একটাতে হিন্দি শেখানো হত বাংলা অক্ষরে লিখে। সমীক্ষায় শিক্ষকদের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল মোট ৪১২ জন, এদের মধ্যে একজন ক্রিশ্চিয়ান, ৪ জন মুসলমান, বাকী সব হিন্দু। শিক্ষকের গড় বয়স ৩৮ বছর। হিন্দু শিক্ষকদের মধ্যে কায়স্থ শিক্ষক সর্বাধিক, ২৫৬ জন। এর পরেই ব্রাহ্মণ ৮৬জন। মুর্শিদাবাদ জেলার মত এই জেলাতেও তথাকথিত নিচুবর্গের শিক্ষকও ছিল। অ্যাডাম্‌স্ প্রায় ১১ জন সহশিক্ষকের দেখা পেয়েছিলেন যাঁরা ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। আর একটি গ্রামের বেশ অবস্থাপন্ন একজন বয়স্ক ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়াতেন আর চাষবাস করে নিজের সংসার চালাতেন। অ্যাডামসের দেওয়া তথ্য অনুসারে বিভিন্ন অংকের পারিশ্রমিক মিলিয়ে ৩২৫ জন শিক্ষকের সর্বমোট সাম্মানিক ছিল মাসে ১১.২৫ টাকা। হিসাবে দেখা গেছে ৪০১ জন শিক্ষকের গড় সাম্মানিক ছিল মাসে ৩ টাকার মত। স্কুলগৃহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে অ্যাডাম্‌স্ বলেছেন, ১ টাকার ৪ আনা খরচ করে একজন শিক্ষক স্কুলগৃহ তৈরি করেন। তাঁর ছাত্ররা জঙ্গল থেকে সামগ্রী জোগাড় করে আনে। আর একটি গ্রামে ছাত্ররা নিজেরাই শ্রম দিয়ে একটি স্কুলগৃহ বানিয়েছিল, খরচ হয়েছিল ১ টাকা ৮ আনা। পাতা, খড় প্রভৃতি দিয়ে ও অন্য সামগ্রী দিয়ে বানানো হয়েছিল। কয়েকটি স্কুলগৃহ অভিভাবকদের চাঁদায় তৈরি হয়েছিল। এছাড়া বৈঠকখানা, কাছাড়ি বাড়ি, বাড়ির বারান্দা, দোকান ও মন্দির প্রভৃতি পড়ানোর জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হত। ৪১২ টি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬,৩৮৩ জন,

গড়ে স্কুল প্রতি ১৫.১৪ জন। সমীক্ষা চলাকালীন ছাত্রদের বয়সের গড় ছিল ১০.০৫ বছর। পড়াশুনার আগ্রহ যে নিম্নবর্গের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল তা অ্যাডামসের দেওয়া তথ্যেই প্রমাণিত। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই ছিল সংখ্যায় সব থেকে বেশি, ১৮৫৩ জন। এছাড়া গোয়ালা, বৈশ্য ও অন্যান্য প্রায় সকল বর্গের ছাত্রই ছিল, এমনকী মুচি ও চণ্ডাল ঘরের ছাত্রও ছিল। অ্যাডাম্‌স্ বলেছেন, ব্রাহ্মণের এই সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, পার্থিব যেসব কাজ তাদের জাতের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল না, এখন সে সব কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে চাইছে। আরও একটি জিনিস অ্যাডাম্‌সের চোখে পড়েছিল। তিনি নিচু বর্গের মাত্র দুজন ছাত্রকে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলে দেখেছিলেন। সুতরাং বাকীরা দেশীয়দের পরিচালনাধীন স্কুলেই ছিল। হিন্দি স্কুলগুলিতে তিনি কাঠের বোর্ড ব্যবহার হতে দেখেছিলেন। বাংলা স্কুলগুলিতে লেখার জন্য পাতা ব্যবহার হত। এমনকী শালপাতাতেও লেখা হত। তবে শুরুতে সবাই মাটিতেই লিখত। শেষ ধাপে এসে কাগজে লিখত। এই জেলার ৪১২টি দেশীয় স্কুলে কী শেখানো হত তাও আছে রিপোর্টে। একটি স্কুলে যিশুর নির্দেশাবলী পড়ানো হত; ৩৫টি স্কুলে ব্যবসার হিসাবনিকাশ শেখানো হত; ৪৭টি স্কুলে চাষবাসের হিসাবনিকাশ শেখানো হত; আর ৩১৬টি স্কুলে ব্যবসায়িক ও চাষবাস সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ শেখানো হত। এছাড়া একটি স্কুলে ব্যবসায়িক হিসাব ও লেখার কাজ শেখানো হত এবং ১২টি স্কুলে ব্যবসায়িক হিসাব ও চাষবাসের হিসাবনিকাশ ও তার সাথে লেখার কাজ শেখানো হত। অ্যাডাম্‌স্ ৮টি স্কুলে শুভঙ্করী পদ্ধতিতে অংক করাতে দেখেছিলেন।

হিন্দু ছাত্রদের জাত বিভাজনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম্‌স্ মোট ৫০টি জাতের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল সকলেই ছিল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য শিক্ষার জগতে নিম্নবর্গের মানুষের জাগরণ ঘটেছে।

বর্ধমানঃ এই জেলার ১৩টি থানাতেই অ্যাডাম্‌স্ সমীক্ষা করেন এবং ৯৩১টি স্কুলের সন্ধান পান। প্রতিটি থানাতেই বাংলা ও সংস্কৃত মাধ্যম স্কুল ছিল। জেলা জুড়ে বাংলা মাধ্যম স্কুল ছিল মোট ৬২৯টি এবং সংস্কৃত মাধ্যম স্কুল ছিল ১৯০টি। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির মধ্যে ৭টি পাওয়া গিয়েছিল একটি গ্রামে, ৬টি অন্য একটিতে এবং ৫টি তৃতীয় একটিতে। ৯টি গ্রামের সন্ধান মিলেছিল যেগুলির প্রতিটিতে ছিল ৩টি করে স্কুল, ৫৯টিতে ২টি করে এবং বাকীগুলিতে একটি করে। কয়েকটি গ্রামের স্কুলের সংখ্যাধিক্য শিক্ষার আগ্রহকেই তুলে ধরে। বাংলা স্কুলগুলিতে শিক্ষকের মোট সংখ্যা ছিল ৬৩৯। কোনও কোনও স্কুলে একাধিক শিক্ষক ছিল যাদের গড় বয়স ছিল ৪০ বছর। শিক্ষকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল মোট ২৭টি জাত ছিল। সর্বাধিক ছিল কায়স্থ, ৩৬৯ জন। এরপরেই ছিল ব্রাহ্মণ, ১০৭ জন। নিচুবর্গের শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই জেলায় অ্যাডম্‌স্ চার জন শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছিলেন যারা বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। এদের মধ্যে একজন মুসলমান এবং তিন জন হিন্দু ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে একজন ছিল চণ্ডাল। বাকী ৬৩৫ জন শিক্ষকের মোট মাইনে ছিল ২০৭৬ টাকা। গড়ে প্রতি শিক্ষকের মাসিক মাহিনা ছিল তিন টাকার সামান্য বেশি। শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছাড়াও সংসার প্রতিপালনের জন্য অন্য কাজ করতেন। যেখানে ব্যবসা থেকে পুরোহিতবৃত্তি সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু স্কুল ছিল মিশনারিদের পরিচালিত, যেগুলিতে শিক্ষকদের মাইনে মিশনারিরাই দিত। আবার কিছু স্কুল ছিল যেগুলি শিক্ষকদের মাইনে বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে আসত। কয়েকজন হিন্দু ছাত্রের খাওয়া খরচও বর্ধমানের মহারাজা চালাতেন। সে সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অগ্রণী ভূমিকা অ্যাডাম্‌সের দেওয়া একটি তথ্য থেকে বেশ স্পষ্ট। মিশনারিদের পরিচালিত একটি স্কুলে ছাত্রদের নদী পেরিয়ে আসতে হত। তাদের নদী পারাপারের জন্য মিশনারিরাই নৌকার ব্যবস্থা করেছিল। এই জেলা অ্যাডম্‌সের মতানুযায়ী ছিল বীরভূমের মতই। একটি ক্ষেত্রে কেবল ব্যতিক্রম দেখেছেন অ্যাডাম্‌স্। সেটি অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সাহায্যে তৈরি হয়েছে। ৬২৯টি বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছাত্র ছিল ১৩,১৯০ জন, অর্থাৎ গড়ে স্কুলপ্রতি প্রায় ২১ জন। তাদের গড় বয়স ছিল সমীক্ষার সময় প্রায় ১০ বছর। তাদের স্কুলে ভর্তির ও স্কুল ছাড়ার গড় বয়স যথাক্রমে আনুমানিক ৬ বছর ও ১৭ বছর। ছাত্রদের মধ্যে ১৩ জন ছিল ক্রিশ্চান, ৭৬৯ জন মুসলমান ও ১২,৪০৮ জন হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল মোট ৫১টি জাতের ছাত্র ছিল। ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় ছিল সব থেকে বেশি, ৩,৪২৯ জন। এরপরেই ছিল কায়স্থরা, ১৮৪৬ জন। অন্য জেলা দুটির তুলনায় এই জেলায় ছাত্র সংখ্যা বেশি, উচ্চ ও নিচ উভয় বর্গের ক্ষেত্রেই। আর একটি বিষয়ও অ্যাডম্‌স্ লক্ষ্য করেছিলেন, মিশনারি স্কুলগুলিতে নিচুবর্গের ছাত্রসংখ্যার অনুপাত বেশি। লেখার ক্ষেত্রে অ্যাডম্‌স্ যে বিবরণ দিয়েছেন তা আগের জেলাগুলির মতই। বিদ্যালয়ের যে বিবরণ দিয়েছেন বা তিনি বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। অ্যাডম্‌সের এই বিবরণী থেকে কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট ভাবে জানা যায় –

১. অ্যাডাম্‌স্ যে সময় সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন সে সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সরকারি উদ্যোগ ছিল না। শিক্ষার উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল ছিল কোন রাজা, জমিদার, অভিভাবক, মিশনারি বা শিক্ষকের উপর।

২. স্কুলগৃহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল না, স্কুল বসত মন্দিরের চাতালে, জমিদারবাড়ির দাওয়ায়, গাছতলায়, এমনকি মুদিদোকানেও।

৩. ছাত্ররা নানা জাতের ছিল। তাদের মধ্যে জাত ভেদাভেদ খুব প্রকট ছিল না। শিক্ষকদের মধ্যেও নানা জাতের মানুষ ছিল। এক্ষেত্রেও জাত ভেদাভেদ খুব প্রকট ছিল না।

৪. শিক্ষকদের মাইনে খুবই কম ছিল, তাই সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁদের অন্য কাজও করতে হত। অভিভাবক বা ধনী ব্যক্তিরা মাইনের ব্যবস্থা করত। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্ররা পথে পথে গান গেয়ে মাইনে ভিক্ষা করতো।

৫. সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। শিক্ষকরা মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন।

গণশার চিঠি

লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদার সারা জীবন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যুক্ত থাকলেও তিনি ভোলেননি 'বিদ্যালয়' ব্যবস্থার ধূসর চিহ্নগুলি, যেখানে প্রতিনিয়ত জমাট বাঁধে শিশু – কিশোরদের হতাশার জীবনবেদ। 'গণশার চিঠি' এমন একটি গল্প যেখানে বিবৃত হয়েছে এক কিশোরের আপাত হাস্যরসে উপস্থাপিত বেদনারই কাহিনী।

ভাই সন্দেশ,

অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয় যেত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেত!

আজকাল আমি মামারবাড়ি থাকি। আমার মনে হয় ওরা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে মাষ্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মানদা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর বছরের শেষের দিকে গুটিকতক টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু সুবিধের কথা নয়। ছেলেগুলো যায় কোথায় ?

মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটাও ভাই কেমন যেন! সরু-ঠ্যাং পেন্টেলুন উনি কখনো ধোপা বাড়ি দেন না। শাদা কালো চৌকোকাটা কোট পরছেন তো পরছেনই! আবার চুলগুলো সামনের দিকে খুদে খুদে, পেছন দিকে লম্বা মতন, মধ্যিখানে দাঁড় করানো! মাঝের গোঁফ বেঁটে খাটো পাশের গোঁফ ঝুলোঝুলো! ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কিসের চামড়া, কিসের তেলে ডুবিয়ে, কিসের লোম দিয়ে সেলাই করা!

ও বাবাগো, মাগো! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে! মানকে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভেতর সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই পা নাচাচ্ছেন! পরের সপ্তাহে মানকে আবার দেখেছে ঘরের ভেতর ছটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের করছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে, ঘরের ভেতর পাঁচটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই সেফটিপিন দিয়ে কান চুল্কোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে নটা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন! তা ছাড়া সেই যে বিভু আরশোলা পুষতো, একবার গুবড়ে খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে – মাস্টারমশাইয়ের ট্রাঙ্কে হলদে মতন তুলোট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কালিও হতে পারে!

ওঁর লেবু গাছে মাকড়সারা কেন জানি না জাল বোনে না; পেঁপে গাছে সেই গোলচোখ চকচকে জন্তু নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে, মাস্টারমশাইয়ের রোগা গিন্নি মোটা বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে দিনরাত ওত পেতে থাকেন। কিন্তু কিছু বলা যায় না! মনদা তো ওবাড়ি কোনোমতেই যায় না, মেজো ওবাড়ির ছায়াটি মাড়ায় না, আর ছোট ছেলে ধনা তারতো ওবাড়ির হাওয়া লাগলেই সর্দিকাশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ওবাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা সজনের ডাঁটা নেয় না!

মা কিন্তু ওদের কুমড়ো ডাঁটা দিব্যি খান, আর বড় মামা তো ওঁরই দাদা, ওই একই ধাত! ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কি ম্যাজিক, কি মন্তর পড়া এসব একেবারে বিশ্বাস করেন না! কে জানে কোন দিন হয়তো কানে ধরে ওই ইস্কুলেই আমাকে ভর্তি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারা জীবন ব্যা – ব্যা করে নটে চিবুবো? ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড় মামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন, পাথরের উপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি! – কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ! কান্না পেয়ে গেল ভাই।

অ্যাদ্দিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে। বড়মামা যখন তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচর ফ্যাচর হাসেন। বুঝছি গতিক ভালো নয়। দু একবার তিন তলার ছাদে গিয়ে ব্যা–ব্যা–করে ডেকে দেখেছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না খানকতক দুব্বো চিবিয়ে দেখেছি–বদ খেতে, তাতে আবার ছোট্ট শুঁয়োপোকা ছিল! খোকনকে বলেছি গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজি হল না। এদিকে অভ্যেস না থাকলে কী যে হবে তাও তো জানি! এই সব নানা কারণে এতকাল চিঠি লিখতে পারিনি, বুঝতেই তো পারছ। একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর সইল না। 'কেডস' পায়ে দিয়ে সুটসুট করে মাস্টারমশাইয়ের বেড়া টপকে, ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে, জানলার গরাদ খিমচে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়িমাছের মতন ডাঙার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারলুম। দেখলুম মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে হুঁকো খেতে চেষ্টা করেছেন, আর গিন্নি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন,–কোনোটা আস্ত উঠছে, গিন্নি হাসছেন; কোনোটা আধ-খ্যাঁচড়া উঠছে, গিন্নি দাঁত কিড়মিড় করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বলে সমস্তক্ষণ বকবক করছেন। ভাই, বড় ভালো লাগলো।

কিন্তু আনন্দের চোটে যেই খচমচ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চমকে বললেন 'ওটা কি রে?' ভাবলুম এবার তো গেছি! কান ধরে ঝুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নখ দিয়ে খিমচে দিয়ে গিরগিটি মতন মুখ করে বললেন – 'ও বাঁদর!' বললুম, 'আজ্ঞে স্যার, ছাগল বানাবেন না স্যার!' বললেন, 'বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?' গিন্নিও ফিসফিস করে যেন বললেন, 'ওটিকে রাখো, আমি পুষব'।

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিন্নি মাথায় শিং আছে কি না দেখে বললেন, 'তোমার মতন আমার একজন খোকা ছিল'। জিজ্ঞেস করলুম, 'তার কি হল?' বললেন, 'তার এখন দাড়ি গজিয়েছে।' বলে বড় বড় বাতাসা খেতে দিলেন। তারপর বাড়ি চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না, দাড়ির সঙ্গে খুরও গজিয়েছিল কি না।

ইস্কুলের কথা এখনও কিছু ঠিক হয়নি, এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিও না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে–টোঁয়াড়ে খোঁজ কোর।

ইতি – তোমাদের গণশা

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

নিকোলাই ফ্রিদরিক সেভেরিন গ্রুনউইগ

ইউনেস্ক (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ
ম্যাক্স লসন -এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

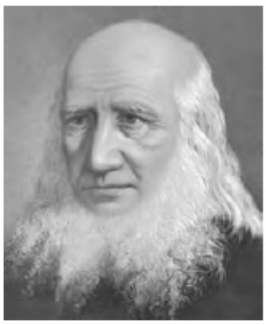

(১৭৮৩-১৮৭২)

ডেনমার্কের একটি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামের গির্জার ধর্মযাজকমহাশয় আর পাঁচজনের থেকে অনেকটাই আলাদা। গির্জা সংলগ্ন তাঁর যে বাড়ি তাঁর পড়ার ঘর থেকে তিনি প্রায় বের হন না। রাত দিন লিখে চলেছেন। কেবল উপাসনার সময় গির্জার প্রার্থনা ঘরে দর্শনার্থী সামনে আসেন, এটুকুই যা। আর সে কি সব যুক্তিপূর্ণ, তার্কিক লেখা। লেখা গুলো ঝড় তুলত ধর্মীয় মহলে। খস্‌খসে রুক্ষ মেজাজের গ্রুনউইগ ছিলেন "দৈত্য কূলের প্রহ্লাদের" মতো। যাজক হলেও তাঁকে প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হতো না, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিচালনার ভার পেতেন না। তার একমাত্র কারণ তাঁর "সৃষ্টি ছাড়া" ভাবনা-চিন্তা, ক্ষুরধার লেখনী। যা তখনকার ধার্মিক, রক্ষণশীল চিন্তাধারার বিপরীতে বইত। সবার কাছে বড়ই অপ্রিয় ছিলেন তিনি। নিকোলাই এফ এস গ্রুনউইগ – ধর্মযাজক হয়েও তাঁর কাজের বিস্তার ছিল নানা দিকে। ছিলেন শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, লেখক, কবি। বরং ছিলেন না ঈশ্বরতাত্ত্বিক। ধর্মযাজক বাবার ধার্মিক প্রভাব ছাপিয়ে নিকোলাইয়ের মনে বড় বেশি করে ছাপ ফেলেছিলো নর্ডিক পুরাণ কাহিনীগুলো, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান লোকগল্প, চারণ কবিদের গান, বীরগাথা নিকোলাইকে টানত। নিজেও লিখেছেন প্রচুর স্তব – স্তোত্র – গান।

ছোট্ট নিকোলাই-এর ছেলেবেলা ঘিরে ছিল এক কথা-বলার জগৎ। একদিকে গল্প, আর কথামালা ওল্ড নর্স-এর লেখা পুরাণ কাহিনী, বীর গাথা আর অন্য দিকে ধর্মপ্রাণ , রক্ষণশীল বাবার ধর্মীয় উপদেশ। বড় হয়ে নিকোলাই সেই ছোট বেলায় শোনা ওল্ড নর্স মিথগুলি অনুবাদ করতে শুরু করেন। আর এত মনোগ্রাহী হয় সেই অনুবাদ যে তার জোরে রাজ আনুকূল্যের বরাত জুটে যায়। রাজার অনুদানে তিনি ইংল্যাণ্ড যান। দেখে আসেন ১৯ শতকের শিক্ষার পীঠস্থান – ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা। সেটা ছিল ১৮১২। এদিকে এলো ১৮৩০ সাল। গোটা ডেনমার্ক জুড়ে তখন পরিবর্তনের ঢেউ। রাজা সপ্তম চার্লস এর হাত ধরে গণতন্ত্র পা রাখছে ড্যানিশ রাজনীতির অলিন্দে। রাজা তৈরি করছেন মন্ত্রণা সভা যেখানে আপামর জনসাধারণ মতামত দেওয়ার জন্য - শোনার জন্য যোগ দিচ্ছেন। এর আগে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে আইন পাশ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে গ্রুনউইগের কাছে মন্ত্রণা সংসদে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ওনার মনে হয়েছিল গোটা ব্যাপারটাই অ-সার, মুখের কথা। পরে তিনিও বুঝতে পারেন যে সত্যি সত্যিই সমাজের নীচু স্তরের কথা শোনা হচ্ছে এই সংসদ গুলিতে। এটা বুঝে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত লেখা-পত্র যেন বেড়ে গেল। "মানুষের কণ্ঠ স্বর" তৈরি করতে হবে। এর জন্য চাই শিক্ষা। বস্তা-পচা লাতিন ভাষায় শিক্ষা নয়। চাই ডেনমার্কের মাতৃভাষায় শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাধান্য পাবে বচন – কথা বলা। যুগ যুগ ধরে যে কথা বলা – গল্প বলার ঐতিহ্য বয়ে চলেছে এ দেশ জুড়ে – সেই মৌলিক যোগাযোগের ভাষা -প্রাণভোমরা হয় এই শিক্ষা পাঠক্রমের। আর পাঠক্রমের আসল কুশীলবরা হবেন এক দিকে ড্যানিস চারণ কবিরা, আর অন্যদিকে পড়ুয়ারা হবেন সমাজের নানা স্তর থেকে, নানা বৃত্তি থেকে উঠে আসা নানা বয়সের সাধারণ মানুষ। গ্রুনউইগ-এর মতে এই স্কুলের আসল শিক্ষক হবেন চারণ কবিরা তাঁর মতে চারণ কবিরা সাধারণ মানুষের আসল শিক্ষক। কারণ "তাদের গলার স্বরেই মিশে থাকে পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা জাগানোর, লালন পালনের ক্ষমতা, তাদের ভাষায় মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা আরো শক্তিমান হয়ে ওঠে, ধনী হয়ে ওঠে।" এই ধরনের শিক্ষাক্রমে পুরাণকাহিনী, বীর গাথা, ড্যানিস ছড়া, কবিতা গুরুত্ব পাবে।

কেমন হবে এর উপযোগী বিদ্যালয় ?

গ্রুনউইগ দাবি করলেন এক ফোক-হাই-স্কুল বা লোক-বিদ্যালয় তৈরি করার জন্য। কেমন সে স্কুল ? গ্রুনউইগ লিখলেন কখনই সেই স্কুল লাতিন – গ্রামার স্কুল নয়। ও গুলো যেন এক একটা "মৃত্যুপুরী"। গ্রুনউইগ দাবি করলেন "জীবনের জন্য স্কুল" বা "ফোক-হাই-স্কুল"। যেখানে ঘটবে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের আদান – প্রদান, জীবনের সঙ্গে জীবনের মেল বন্ধন। শিক্ষক আর পড়ুয়ারা হবে একে অপরের সাথী, সহচর। আবাসিক হবে এই স্কুল। এই স্কুলে যা পড়ানো হবে তার সঙ্গে থাকবে জীবনের যোগ। নিজেদের চেনা জানা জগতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে শিক্ষক আর পড়ুয়ারা, ক্লাস ঘরে হবে আদান-প্রদান। আর হবে জানা-শেখা-বোঝা। তারপর পড়া শেষ করে এক এক করে যখন তারা ফিরে যাবে নিজেদের চেনা পরিবেশে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে অর্জিত জ্ঞান। ব্যক্তি মানুষটি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ-সংসার বিকশিত হবে। এ যেন লাতিন-গ্রামার স্কুল ধারার একদম বিপরীত ধারা। এখানে থাকবে না বইপত্রের সমাবেশ, না থাকবে পরীক্ষা ব্যবস্থা। এই স্কুল বাস্তবে রূপ দেবে যীশু খৃষ্টের

"Living Word" বা "জীবন্ত শব্দ" কে।

অন্তিম ভোজনে বসেছেন যীশু, সঙ্গে রয়েছে তাঁর ১২ জন শিষ্য যারা এসেছেন সমাজের নানান স্তর থেকে। যীশু আর শিষ্যরা – শিক্ষক আর তাঁর ছাত্রদল। রুটি খেতে খেতে আর সুরা পান করতে করতে চলছে কথা। "জীবন্ত শব্দ" "Living Word" - Phrase টি যীশু ব্যবহার করেছিলেন সেদিন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি নিঃশব্দ ছিল না। এখানে কথা বলা হচ্ছিল। যীশু

Rodding Højskole,
১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ডেনমার্ক প্রাচীনতম লোক উচ্চবিদ্যালয়

বলছেন চির সত্যের কথা। বাকিরা শুনছেন – সাড়া দিচ্ছেন। যীশুর কথাগুলো মৃত শব্দ ছিল না। এদের মধ্যে প্রাণ ছিল – যীশুর প্রাণ মিশে ছিল। শক্তিমান শব্দ, সক্ষমতার শব্দ যীশুর মুখ থেকে ঝরে পড়ছিল, আর সেই শব্দগুলো শিষ্য – শ্রোতাদের মনে সক্রিয় সাড়া জাগাচ্ছিল। ধর্মযাজক গ্রুনউইগ Last Supper -এর এই ঝরে পড়া দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্নের লোকবিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে। যা ক্লাসের নির্দিষ্ট কক্ষ ছাড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর জগতে ছড়িয়ে পড়বে – ফোক হাইস্কুলের পড়ুয়াদের মাধ্যমে। গ্রুনইউগের ফোক হাইস্কুল সংক্রান্ত ধারণা প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৩২ সালে। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন নর্ডিক পুরাণচর্চায়। তিনি লিখলেন "নর্ডিক মিথলজি (নর্ডেনস্ মাইথোলজি)" নামক বইটি। আর এই বইয়ের ভুমিকায় প্রথম দেখা যায় ভবিষ্যতে লোক-বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারণা। গ্রুনউইগ ফোক হাইস্কুলের প্রবক্তা হলেও তিনি এই স্কুল স্থাপন করেননি। জীবনের মধ্য ভাগে তিনি ভারটোভ গির্জার বিশপ নিযুক্ত হন। আর এই গির্জার পড়ার ঘর থেকে লোক-স্কুলের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ১৮৪৪ – এ প্রথম ফোক স্কুলটি রডিং –এ তৈরি হয়। গ্রুনউইগের সুযোগ্য শিষ্য ক্রীস্টেন কোল্ড নিজের স্কুলটি স্থাপন করে লোক-স্কুল আন্দোলনের সূচনা করেন। গ্রুনউইগ কিন্তু তাঁর পড়ার ঘর আর লেখার টেবিলের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরোতেন না। একমাত্র গির্জার অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেত। অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর চিন্তা ধারায় তৈরি হওয়া স্কুলগুলিকেও দেখতে যেতেন না। কোল্ডই আসতেন তাঁর কাছে মুশকিল আসানের পথ খুঁজতে। ১৮৬৪ সাল- ইতিমধ্যে সারা ডেনমার্ক জুড়ে তৈরি হয়ে গেছে ১৫ টি ফোক হাই স্কুল। ডেনমার্ক জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে আর প্রুশিয়ান-অস্ট্রিয়ান সৈন্যদলের কাছে হেরে গেল ডেনমার্ক। এরপর হল জামার্নির সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেও ডেনমার্ক পরাজিত হল। ডেনমার্কের প্রথম ফোক হাইস্কুল ছিল রডিং -এ। সেই রডিং চলে গেল জামার্নির দখলে। পরাজিত ডেনমার্কের একদম উত্তর সীমান্তে অ্যাসকভে। যেহেতু জার্মান সীমানার কাছে, তাই অ্যাসকভে স্কুলটিতে ড্যানিশ সংস্কৃতি চর্চার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। অ্যাসকভের স্কুলটিকে সামনে রেখে এরকম আরো স্কুল তৈরি হল সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ফোক হাইস্কুলের সেটা ছিল স্বর্ণ যুগ। ফোক হাইস্কুলের মাধ্যমে পড়ুয়ারা জানবে তার "পিতৃভূমির কথা, দেশের মানুষের কথা, মাতৃভাষার কথা, দেশের রাজার কথা" – এই ছিল গ্রুনউইগের বাসনা। তিনি বলেছেন এমন এক লোকজীবনের কথা যা আর সবাইকে কাছে টেনে নেয়। এই লোকজীবন চর্চা করার অর্থ দেশের মানুষের পরিচিতির স্বীকৃতি দেওয়া, সংরক্ষণ করা, দেশের মানুষের সাহিত্য, কবিতা ও জীবনচর্চাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আপাত ভাবে উগ্র-জাতীয়তাবাদী মনে হলেও, গ্রুনউইগের লেখা ভালো করে বুঝে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি আদতে ছিলেন একজন বিশ্ববাসী ও জীবনবাদী মানুষ। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর প্রবর্তিত ফোক হাইস্কুল উৎখাত হওয়া মানুষজনের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ফোক হাইস্কুলের আন্তরিক, অত্যন্ত আপন, চেনা-জানা পাঠক্রম বহু বহু সাধারণ খেতখামারের খাটা ড্যানিশ চাষিকে স্কুল শেষ করে নিজেদের জানাশোনাকে আরো বিকশিত করে নিজেদের জীবিকায় ফিরে যেতে সাহায্য করেছিল। শিক্ষিত হয়েও তাঁরা তাদের জীবিকাচ্যুত হননি। গ্রাম ও কৃষি-ভিত্তিক জীবিকা ও অর্থনীতিকে এই স্কুল আন্দোলন আরো উজ্জীবিত করেছিল। সময়ের সঙ্গে ড্যানিশ সমাজে পরিবর্তন এসেছে। কৃষি থেকে

গ্রুনউইগ লোক উচ্চবিদ্যালয়

ক্রমে এ দেশ শিল্পনির্ভর হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে ফোক হাইস্কুলগুলিও তাদের চরিত্র বদলেছে। ভাবা হয়েছিল গ্রুনউইগের ফোক স্কুল হয়তো ২০ শতকের আলো দেখবে না। শত্রুর আশায় ছাই দিয়ে ডেনমার্ক জুড়ে ফোক হাইস্কুল আরো আরো তৈরি হয়েছে। সেটা ১৯৮০ সালেও। সাম্প্রতিক কালেও এর প্রসার দেখা যায়। পাশাপাশি সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ও জার্মানি, পোল্যাণ্ডেও ফোক স্কুলের ঢেউ গিয়ে পড়ছে।

গ্রুনউইগ চেয়ে ছিলেন স্বল্প মেয়াদের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে "মৃত জ্ঞানকে" প্রতিস্থাপিত করবে জীবন। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সরিয়ে জায়গা করে নেবে জীবনমুখী "অন্য আর এক রকম ব্যবস্থা।" এই স্বপ্নপূরণের জন্য আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে – ভবিষ্যতের দিকে।

জে. কৃষ্ণমূর্তি

ইউনেস্ক (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ
মীনাক্ষী থাপান-এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

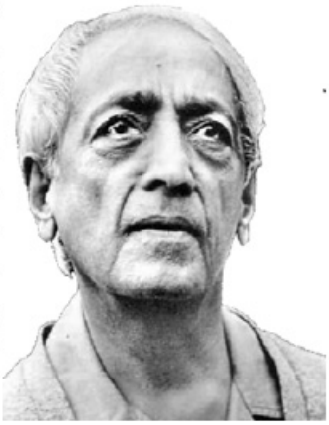

(১৮৯৫-১৯৮৬)

এমন স্কুলও হয় - যেখানে বিকেলের সূর্য দেখতে দেখতে ক্লাস চলছে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আর ঋতুর সঙ্গে বদলে যাওয়া গাছের পাতার রঙ দেখতে দেখতে পাঠের কাজ চলছে। পৃথিবীর মাটিকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ চলছে। রোম্যান্টিক প্রকৃতিবিদের পর্যবেক্ষণ নয় – পৃথিবী – প্রকৃতিকে জড়িয়ে যে সামগ্রিক জীবনপ্রবাহ চলছে সেই ধারাটাকে দেখে – শুনে – বুঝে নেওয়ার চেষ্টাই হলো এই স্কুলের পাঠক্রম। কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশন ইণ্ডিয়া (কে. এফ. আই.) পরিচালিত স্কুলগুলির পাঠ্যক্রম এমনই। বইপত্র সর্বস্ব জানা সব নয়। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির দেওয়া-নেওয়া আর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে শেখায় শিক্ষা।

জে ডি কৃষ্ণমূর্তি দার্শনিক ছিলেন কিন্তু প্রথাগত অর্থে শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না। বাবার প্রভাবে তাঁর যৌবনের অনেকগুলো দিন এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কেটে যায়। মাদ্রাজের (এখন অন্ধ্রপ্রদেশ) থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি। সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন – মন প্রাণ দিব্যজ্ঞানে ভরে থাকত। তবে সেটা একটা বয়স অবধি। থিওসোফিক্যাল সোসাইটির আশা ছিল কৃষ্ণমূর্তি "বিশ্ব-শিক্ষক" বা "সত্যের শিক্ষক" হয়ে উঠবেন। তাঁকে মাথায় রেখে তৈরি হল বিশেষ এক সম্প্রদায়। কৃষ্ণমূর্তি প্রশিক্ষণ পেতে থাকলেন যাতে বিশ্ব-গুরুর পদে আসীন হতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলনের শেষে যে জে. ডি. কৃষ্ণমূর্তি তৈরি হলেন তাঁকে থিওসোফিক্যাল সোসাইটি মোটেও তেমনটি আশা করেনি।

১৯২৯ এর এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি যে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন সেই সম্প্রদায়টিকে ভেঙে দিলেন। নিজেকে সবরকম কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ, আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা জুড়ে থাকল "সু-সমাজ" – এর খোঁজ, যার ভিত্তি হবে "যথার্থ মূল্যবোধ" আর "যথার্থ সম্পর্কের বন্ধন"।

তাঁর মুক্ত ভাবনা তাঁকে মুক্ত করলো গুরু-নির্দেশিত পথ থেকে। জীবন মানে তাঁর কাছে অন্তহীন পথে হেঁটে চলা – একা। সে পথে জানাবোঝা-ই সঙ্গী। এপথে কোন গুরু/ শিক্ষকের পথনির্দেশ লাগে না। এপথের পাথেয় মুক্তমন। যে মন দেখবে, লক্ষ্য করবে ও শিখবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে করতে এই জানাবোঝার পথ চলা চলে, আর প্রতিটি ব্যক্তির এই আত্ম-আবিষ্কার আর তার বাইরের পৃথিবী-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমন্বয় রেখে চলবে। বাইরের আর অন্তরের সমন্বয় সাধন প্রতিফলিত হবে পরিবেশে, সমাজে। ব্যক্তির সৌন্দর্য, শুভবোধ ছড়িয়ে পড়বে পরিবেশে, সমাজে। তৈরি হবে সু-সমাজ। আর এই অন্তরের বদল – নবীকরণের মূলে থাকবে শিক্ষা। এই শিক্ষাই আবার হবে সমাজ বদলের হাতিয়ার।

তাই কৃষ্ণমূর্তি বাতিল করেছেন সেই শিক্ষাকে যেখানে "আগে পাঠ করতে হয়, পরে কাজে করে দেখাতে হয়"। শিক্ষা তাঁর কাছে ভাগ করে নেওয়ার, অংশ নেওয়ার। শিক্ষাকে দান করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।

আজকের এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাজে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণমূর্তি জোর গলায় বলেন "তুমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিও না। ইঁদুর দৌড়ের চূর্ণ দাগে পা রেখো না, যদি তুমি অনাবিল আনন্দের ভাগীদার হতে চাও"।

আবাস্তব লাগছে! কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশনের স্কুলগুলিতে প্রতিযোগিতার লেশমাত্র নেই। এই স্কুলগুলির পাঠক্রম ছাত্র-শিক্ষকের "বিকাশে" বিশ্বাস করে। স্কুলগুলি উন্মুক্ত – প্রকৃতির বুকে প্রকৃতির রস-রূপ-গন্ধকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে। বইমুখী বিদ্যা এখানে চলে না। রেজাল্ট ভালো করার রেশারেশি নেই। নতুন নতুন তথ্য আর তত্ত্ব মিলে কিছু বিষয়ে দক্ষ মানুষ তৈরি করা এই স্কুলগুলির লক্ষ্য নয়। স্কুলগুলির পাঠক্রম দাবী করে – উত্তম আচরণ, ভালো ব্যবহার – কাজ ও সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "আত্ম-বিশ্বাস" ধারণাটির জায়গা ছিল না। তাই তাঁর চিন্তা ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে সব রকমের আত্ম বা অহংকে হটিয়ে দিয়ে বিশ্বাস-আস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। আমাদের চেনা জানা স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও বিচার প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একধরনের তুলনা। যার ফলে ক্লাস ঘরে থাকে দ্বন্দ্ব, ভীতি, অসহায়তা। কৃষ্ণমূর্তির ফাউণ্ডেশন স্কুলগুলিতে শিক্ষকেরা এই তুলনা আর প্রতিযোগী আবহাওয়া বন্ধ রাখতে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকেন। কৃষ্ণমূর্তির কাছে যথার্থ শিক্ষার (যা সু-সমাজের জন্ম দেবে) ভূমিকা হলো ব্যক্তিকে তার চারপাশের সব কিছুর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা। শিক্ষার ভূমিকা অংক-ভূগোলে পারদর্শীতা তৈরি করা নয় বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা নয়। শিক্ষার কাজ একজন যথার্থ মানুষ তৈরি করা, যে বিশেষজ্ঞ হবে না। শিক্ষিত হয়ে সে হয়ে উঠবে এক সার্বিক সত্তা। শিক্ষিত মন ভাববে, চিন্তা করবে, সক্রিয়

থাকবে – জীবন্ত – প্রাণবন্ত থাকবে।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ হলো সম্পর্কিত থাকা – সম্পর্কে থাকা"। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক – মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির। এর মূল কারণ প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত,আলাদা নয়। কৃষ্ণমূর্তি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিচেতনার বদলে সমবেত চেতনায়।

আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাচিন্তা কোথায় স্থান পেয়েছে বা পাবে ?

আমাদের সামনে কী রয়েছে? রয়েছে ভারতীয় শিক্ষানীতি – যাতে জায়গা পেয়েছে সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো চিন্তা ভাবনা। শিক্ষানীতিতে স্থান পেয়েছে শিক্ষার প্রভাব পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানান উদ্যোগের কথা – সরকারি প্রচেষ্টায় সর্ব সাধারণের জন্য আবশ্যিক শিক্ষাক্রম, কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা, প্রাথমিক – মাধ্যমিক - উচ্চস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শিক্ষানীতির কথা – ভাষা – ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার বিপুল ফারাক। চারদিকে শিক্ষার ব্যর্থতা। শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা জোগাড়ের যোগ নেই তাই শিক্ষিত হয়ে কাজ জোগাড় করা যায় না। সাক্ষর শিক্ষিত মানুষ তার পরিবারের জন্য স্বচ্ছলতা এনে দিতে পারছেন না – পারছেন না মানসিক সহায়তা এনে দিতে।

চারদিকে এক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এটা কী আমাদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দান নয় ? কোথাও কী শিক্ষার মর্মার্থ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে ?

কৃষ্ণমূর্তির দর্শন স্থান পেয়েছে আমাদের দেশের প্রথাগত স্কুলের পরিবেশ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে। কে এফ আই স্কুলগুলির পরিবেশ বিদ্যায় পরিবেশ – প্রকৃতির নবীকরণ জায়গা করে নেয়। পরিবেশবিদ্যার পাঠক্রমে এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার সাহায্যে স্কুল সংলগ্ন স্থানীয় কমিউনিটি পরিষেবা পায়। ফলে কমিউনিটির সঙ্গে স্কুলগুলির সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এই কমিউনিটির পরিবেশ বিস্তার ঘটে, আরো বড় মাত্রা পেয়ে যায়। আমাদের দেশের কিছু বোর্ড (যেমন আই. সি. এস. ই.) কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশনের পরিবেশবিদ্যার বিষয়টি গ্রহণ করেছে।

কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশন পরিচালিত কয়েকটি স্কুল চেন্নাই, মুম্বাই, পুনা ও উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গায় ছড়িয়েছে। চেন্নাইয়ের কাছে মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূর্তির জন্মস্থানে) সংলগ্ন উন্মুক্ত মনোরম পরিবেশে তৈরি হয় ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টার যা কিনা কে এফ আই পরিচালিত প্রথম স্কুল।

ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টারের অন্তগর্ত রুরাল এডুকেশন সেন্টারটি,মাদানাপল্লীরআশেপাশের গ্রামগুলিতে তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে। এর সাহায্যে পাশাপাশি বহু গ্রামে গুণগত মানের প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে গেছে। তৈরি হয়েছে দুটি "হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য" বহুস্তরীয় স্কুল। ১৬টি বহুস্তরীর ছোট ছোট স্কুল, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাস্তবের শ্রীহীন প্রাথমিক স্কুল যেখানে ঘুপচি ঘরে, একঘেয়ে সুরে একক শিক্ষক একপাল বাচ্চাকে নিয়ে ক্লাস করেন। সেখানে ছাত্র অনুপস্থিতি ভীষণ সমস্যা, অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগের অভাব। অর্থ নেই, শৌচালয়হীন, পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই। এই পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঋষি ভ্যালির রুরাল এডুকেশন সেন্টার তৈরি করেছে "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্প। এই ব্যবস্থায় রয়েছে নিজে নিজে শিখে ফেলা যাবে এমন উপকরণ। উচ্চমানের অথচ ছাত্র-বন্ধু, ছাত্র-উপযোগী, চেনা-জানা বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরি শেখার উপকরণ, সঙ্গে থাকছে কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগকারী বিষয়। এই "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। সরকারি, প্রথা-বহির্ভূত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থাগুলি রুরাল এডুকেশন সেন্টারের এই প্রকল্প থেকে সাহায্য নিচ্ছে।

NCERT তাদের ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়টি যোগ করেছেন। যেখানে স্থান পেয়েছে – নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রমী, পরিষেবা ও কর্তব্যবোধ, সাম্যতা, সহযোগিতা, ও সত্যতার মতো মূল্যবোধগুলি। আশা করা হচ্ছে স্কুল পাঠক্রমের মাধ্যমে ক্লাসঘরে ছড়িয়ে পড়া এই বোধগুলি লড়বে সমাজ জুড়ে গেঁড়ে বসা অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, হিংসা, কুসংস্কার ও দুর্দশাগ্রস্ততার বিরুদ্ধে। আমাদের দেখতে হবে বোধগুলো কি উপর থেকে "বাণীর" মতো চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নাকি বোধগুলো সৃষ্টি হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে! এখানেই প্রয়োজন কৃষ্ণমূর্তির যথার্থ শিক্ষা ধারণার। যে শিক্ষা রূপান্তরকামী। আমাদের শিক্ষানীতি সেই রূপান্তরকামী যথার্থ শিক্ষাকে প্রতিফলিত করবে তো ?

ইভান ইলিচ

ইউনেস্ক (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ
মার্সেলো গাজারদো-এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এক যে ছিল রাজার দেশ
সব রকমের ভালো
রাতে সেথায় বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।

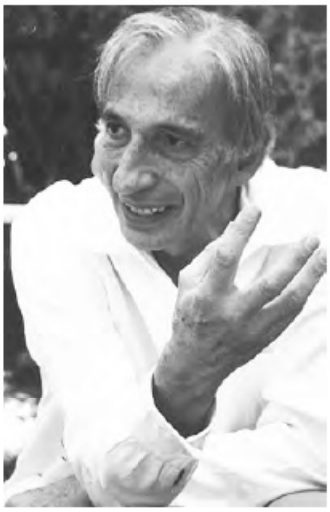
(১৯২৬-২০০২)

এমন উল্টো অবস্থা যদিও বা হয়। কিন্তু এমনটা কি হওয়া সম্ভব – পড়াশোনা – শেখা – জানা চলছে কিন্তু স্কুল নেই, বিদ্যালয় নেই, ক্লাসরুম নেই। আর এমনটা হতে বাধা কোথায় ? যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শেখা জানার সুযোগ রয়ে যায়। কেউ না কেউ শেখায়, আর আমরা শিখি। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানত তিনটি লক্ষ্য থাকবেঃ

১) যারা শিখতে চায়, জানতে চায় তাদের সামনে শেখা – জানার সবরকমের রসদ জোগান রাখা। পড়ুয়ারা যে কোন সময় এই শেখা – জানার প্রক্রিয়ার প্রবেশ করতে পারবে।

২) এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যে যিনি কোন বিষয় জানেন বোঝেন এবং তিনি যদি তার জ্ঞান ভাগ করে নিতে চান এবং যাঁরা এই জ্ঞান গ্রহণ করতে চান, শিখতে চান, জানতে চান – এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।

৩) কোন বিষয়ে কেউ যদি তাঁর মতামত দিতে চান, বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে চান, তবে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁকে তাঁর মতামত জানানো সুযোগ থাকবে।

এছাড়াও যথোপযুক্ত শেখা-জানার প্রক্রিয়া সম্ভব করে তোলার জন্য থাকবে নানা ধরনের পরিষেবা। যেমন ধরুন বইপত্র ও নানা ধরণের শিক্ষণ সামগ্রী পাওয়া যাবে লাইব্রেরী, পরীক্ষাগার ও প্রদর্শনশালাগুলিতে। এখানে এসে পড়ুয়ারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পড়াশোনার রসদ জোগাড় করে নিতে পারবে।

যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শেখা জানার সুযোগ রয়ে যায়। কেউ না কেউ শেখায়, আর আমরা শিখি।

আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে নানান প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নানান প্রয়োজনে আসা – যাওয়া করে। যেমন ধরুন কারখানা, রেলষ্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অবস্থান করে নানান বিনোদন কেন্দ্র যেমন নাট্যশালা (থিয়েটার), জাদুঘর, সিনেমা। আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে বসেছি সেখানে এই বিনোদনকেন্দ্রগুলো স্কুলের বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

জাদুঘর, থিয়েটারের মতো বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে রাখা থাকবে কারখানা, বিমানবন্দর, রেলষ্টেশন বা আরো অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমন সব নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। আর জাদুঘর বা থিয়েটার দেখতে এসে হবু পড়ুয়ারা কিছুটা সময় শিক্ষানবিস হিসাবে এখানকার উপকরণ ব্যবহার করে কাজ শিখে যেতে পারবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে নানা ধরণের নেটওয়ার্ক। দক্ষতা আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক – যার সাহায্যে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ তার জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারবেন জানতে ও শিখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে।

এছাড়াও এমন সব নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে নানান শিক্ষণীয় কাজের বিবরণী দেওয়া থাকবে, জিজ্ঞাসু সতীর্থরা এই নেটওয়ার্কের সাহায্য নিয়ে তাদের অজানা বিষয়গুলি জেনে নিতে পারবে।

এহেন মুক্ত, জীবনভোর শেখা – পড়ার ব্যবস্থা কথা ভেবেছিলেন ইভান ইলিচ। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভিয়েনায়,১৯২৬ সালে। পড়াশোনা করেছিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুলে। কর্মজীবনে প্রথম দিকে ধর্মযাজক ছিলেন। পুয়ের্তো রিকোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন। এখানে থাকাকালীন নানা দেশের নানা সংস্কৃতির মানুষের সংস্পর্শে আসেন। বিচিত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ভাবনা জাগে তাঁর মনে। তৈরি করেন আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ কেন্দ্র। ভাষা শিক্ষার সাহায্যে নিজের সংস্কৃতির চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিকে জানা বোঝা ও দেখার চোখ তৈরি করাই ছিল এই কেন্দ্রের কাজ। পরে পুয়ের্তো রিকো ছেড়ে চলে আসেন লাতিন আমেরিকার মেক্সিকোতে। ১৯৬১ সালে এখানেও তৈরি করেন আরও একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগ কেন্দ্র। আর এই কেন্দ্রে বসেই তিনি ভাবতে শুরু করেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা, যা স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে সর্বতোভাবে কেন্দ্রীভূত হবে না। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার অ-সারতা নিয়ে ইলিচের নেতৃত্বে নানান তর্ক – বিতর্ক শুরু হয়। আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর জেহাদ যার ঢেউ গিয়ে পড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আর স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি সবচেয়ে বেশি ধারালো ছিল। স্কুল ছিল ইলিচের কাছে "সোনার পাথর বাটি"। কীভাবে স্কুল ব্যবস্থার বেড়াজাল টপকে শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর ভাবনা। ইলিচ মনে করতেন জীবনধারণের প্রতিটি মুহূর্তে শেখা

– জানার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য করে তুলেছে আজকের সমাজ। শিক্ষাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে স্কুল প্রথা। তাঁরি মতে স্কুল ব্যবস্থা আর শিক্ষা – এদুটির অবস্থান একে অন্যের বিপরীতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন ইলিচ। শিক্ষাকে পণ্য করে বাজারে ছাড়ছে স্কুল। ধনতান্ত্রিক সমাজে স্কুল উৎপাদিত শিক্ষায় এক নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য থাকে। আর এই সমাজে যাদের মুঠোয় মূলধন আছে, তারা এই শিক্ষা নামক পণ্যটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার আদায় করতে পারে।

ফলে সর্বজনের জন্য উত্তম মানের শিক্ষা পরিষেবা স্কুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে স্কুলের ব্যবস্থার সাহায্যে সবার জন্য সমমানের উত্তম শিক্ষাপ্রদান অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের জন্য চাই বিকল্প প্রতিষ্ঠান। স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা যা আমরা বিশ্বজনীন সত্য বলে মনে করি, ইলিচ সেই ভাবনার অচলায়তনে আঘাত করেছেন কড়া ভাষায়। সত্যগুলো যে আসলে অলীক অবাস্তব তাই তিনি বলতে চেয়েছেন। যেমনঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে স্কুল মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। এই বিশ্বাসের ফলে তৈরি হয় স্কুলের চাহিদা। স্কুলের অস্তিত্ব স্কুলের চাহিদা বাড়ায়। স্কুল ব্যবস্থা আমাদের বোঝায় যে স্কুলে যাওয়ার সঙ্গেই মূল্যবোধ শেখা জানা জড়িয়ে আছে। স্কুল হাজিরার সঙ্গে শেখা – পড়া যেন সমানুপাতিক। বেশি বেশি করে স্কুলে গেলে শেখার মূল্য বাড়ে। এই শেখার মূল্য আবার পরিমাপ করা যায় নম্বর, গ্রেড, সার্টিফিকেটের সাহায্যে। ইলিচ এই ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা এমন এক মানবিক প্রক্রিয়া যাতে অন্যের হস্তক্ষেপ সবচাইতে কম লাগে। নিজের জীবনের সঙ্গে যোগ রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে বাইরের কারুর নির্দেশ ছাড়াই পড়ুয়ারা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি শিখে নিতে পারে। শেখার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটে যখন পড়ুয়ারা এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ইলিচ মনে করতেন যে একজন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব উন্নতি বা বেড়ে ওঠা কখনই স্কুল নির্ধারিত মাপকাঠির সাহায্যে বিচার করা যায় না। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের বোঝানো হয়েছে যে স্কুলের তৈরি মূল্যবোধ মাপা যায়।

ইলিচের মতে স্কুল পাঠক্রম বিক্রি করে। আর পাঁচটা বিপণন কেন্দ্রের মতো স্কুলের হাতে পড়ে শিক্ষা পণ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষক যেন পণ্যবণ্টনকারী আর ছাত্র-ছাত্রীরা হলো উপভোক্তা। উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যে ভাবে পণ্যের গুণমানে ঘষা-মাজা করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ের পাঠক্রম এই ভাবে তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ভোগ করার সাথে সাথে তার উৎপাদন ও বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এর জন্য তৈরি হয় ভুরি ভুরি ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট। আর এগুলোকে করায়ত্ত করতে চলে ইঁদুর দৌড়।পড়ুয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের ইঁদুর দৌঁড়। যত ডিগ্রি তত যেন ভালো রোজগারের সুযোগ। পণ্য সর্বস্ব সমাজ এই ধারণায় চলে। বাজারে পণ্যের চাহিদা অনুসারে উপভোক্তারা যেমন নিজেদের ক্রেতা মানসিকতা তৈরি করতে সমাজের অন্যান্য অংশ যেমন – পরিবার, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, গণমাধ্যম প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে স্কুলের ভূমিকা সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রসারি। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার জয় জয়কারের মূলে আঘাত করেছেন ইলিচ। স্কুল শিক্ষার বাধ্যতামূলক অবস্থানকে আঘাত করেছেন তিনি। জ্ঞান আহরণ বা যে কোন শেখা যে একটা প্রক্রিয়া বার বার তিনি আমাদের মনে করাতে চেয়েছেন। আর এই শেখা-জানার প্রক্রিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের আটকে থাকতে পারে না। সত্তরের দশকে ইলিচের ভাবনা শিক্ষাজগতে ঝড় তুলেছিল। তাঁর ভাবনার রেশ ধরে আজ আমরা সেই সব স্কুল দেখতে পাচ্ছি যারা পরিবেশ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দেয়। এবং যারা সামাজিক ভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর ভাবনার মৌলিকতা এতোটাই যে সেগুলোকে বাস্তবায়িত না করা গেলেও তাঁর ভাবনার অকাট্যতা আজ টের পাওয়া যাচ্ছে। ইলিচের স্কুল-হীন সমাজ ভাবনার প্রসার ঘটেছে আজকের শিক্ষাবিদদের মনে। তাঁর ভাবধারার সাহায্য নিয়ে এমন সব নীতি ও প্রকল্প তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মধ্যেকার সঙ্কট দূর করা সম্ভব হচ্ছে। আজকের দিনে প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের জন্য যে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাক্রম তার প্রস্তাবনায় আমরা ইলিচের ভাবনা দেখতে পাই। নানা ক্ষেত্রে যে জীবনভর শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়েছে তাতেও পাই ইলিচের ছোঁয়া। আজ দেশে দেশে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে, তৈরি হচ্ছে গবেষণা ও তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক। এগুলোর সবই ইলিচের ভাবনায় ছিল। একমাত্র ইলিচের ভাবনাকে উপেক্ষা করে বাজার এখন রমরমিয়ে চলছে।

একে বদলাতে গেলে চাই ভীষণ এক বদল – যা ঘটতে হবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে। অর্থনীতি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জীবন ধারণের মাত্রা, কাজের পরিবেশ, শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে। এই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র্য, বে-রোজগারি। আর এই ভীষণ বদলের লক্ষ্য হবে এক সমন্বয়পূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করবে সৃজনশীলতা, মুক্তি ও উদ্দীপনার উপর আর যে প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ অংশ নেবে উৎসাহের সঙ্গে।

মারিয়া মন্টেসরি

ইউনেস্ক (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ
হেরম্যান রোর্হস-এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

(১৮৭০-১৯৫২)

ছোটদের বাড়ি বা চিল্‌ড্রেনস্ হাউস। নতুন ধারার শিক্ষা আন্দোলনের তীর্থভূমি। এই বাড়ির ভিতর চলছে এক কর্মযজ্ঞ। ছোটরা শিখবে, তাই চলছে প্রস্তুতি। শেখার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে – নানান পড়া-শেখার সামগ্রী সাজানো রয়েছে, সেইসব সামগ্রী নেড়ে চেড়ে তাদের শেখা শুরু হচ্ছে। বাচ্চারা শিখছে নিজে নিজেই। মুক্ত শেখা। শিক্ষক রয়েছেন তবে তিনি সাহায্যকারীর ভূমিকায় রয়েছেন। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখছে – একে অপরকে দেখে শিখছে। পড়ুয়ারা এখানে স্বাধীন, সক্রিয়। এই শেখার পরিবেশে পড়ুয়াদের আচার আচরণ লক্ষ্য রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। খেয়াল রাখছেন শিক্ষণ সামগ্রীগুলো যেন বাচ্চাদের ব্যবহারের সুবিধাকে মাথায় রেখে সাজানো থাকে। উপকরণ হাতে নাতে ব্যবহার করে বাচ্চাদের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেটাকেও নজর রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকা। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হলো শিশুর সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শেখার পরিবেশ প্রস্তুত করা। বাচ্চারা সেই পরিবেশে আসবে, থাকবে আর শিখবে। শিশুর অন্তরের বিকাশ যেমন হবে, তেমনি তার বাইরের বিকাশও হবে। শরীরে মনে শিশু উন্নত হবে। শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়, সেটাও খেয়াল রাখা হবে। আর এই গোটা শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি হলো শিশুকে শ্রদ্ধা করা, শৈশবকে শ্রদ্ধা করা, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা মানব জীবনের সৃজনশীলতা বহতা রয় শৈশবের মধ্যেই। শৈশবের প্রতি এই অসম্ভব বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে নতুন ধারার শিক্ষা ভাবনায় জোয়ার এনেছিলেন এক স্নায়ু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর নাম মারিয়া মন্টেসরি। মারিয়া ছিলেন ইতালির মানুষ। তিনি হলেন প্রথম মহিলা, যিনি ডাক্তারি পাশ করেন। এক মানসিক হাসপাতালে কাজ শুরু করেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল ওই হাসপাতালের মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েকটি শিশুর চিকিৎসা ও যত্ন করা। মারিয়া ওদের সেবা করতেন আর দেখতেন কী ভাবে শিশুগুলো নিজের অক্ষম অবস্থাকে অতিক্রম করে খেলাধূলা করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর খেলার জন্য যে অদম্য ইচ্ছে মারিয়াকে তা বিস্মিত করে। তিনি ওদের ইন্দ্রিয়বোধগুলো সচেতন করে তোলার জন্য প্রচুর অনুশীলনী ও একসারসাইজ (শারীরিক ও মানসিক অনুশীলনী) করাতে শুরু করেন। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়েও তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। দার্শনিক – শিক্ষাবিদ রুশোর ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। আর শিক্ষা নিয়ে তাঁর তত্ত্ব, ভাবনা বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য তৈরি করেন একটা ছোটদের বাড়ি বা চিলড্রেনস হাউস। রোম শহরের এক কোণে সান লেরেঞ্জো বস্তি। সেই বস্তির পরিবেশে পরিবর্তন আনতে তৈরি করেন ছোটদের বাড়ি। বাবা-মা-অভিভাবকরা কাজে বেরিয়ে গেলে বস্তির গলিতে গলিতে খেলে বেড়ায়-ঘুরে বেড়ায় অ-গুন্‌তি বাচ্চা। তাদের নিয়ে শুরু হল "ছোটদের বাড়ি"। শিক্ষার হাত ধরে হবে মানব কল্যাণ; মানুষের জীবন ভালো হবে শিক্ষার সাহায্যে- এমন বিশ্বাস-ই তীব্র ভাবে জেগে উঠে ছিল মারিয়ার মনে। "ছোটদের বাড়ি" প্রস্তুত হয়েছিল মারিয়ার শিক্ষণ ভাবনায়। প্রচুর শিক্ষণ – সামগ্রী সাজানো থাকত। বস্তির বাচ্চারা আসত, খেলত, ঐ সামগ্রীগুলো নাড়া চাড়া করত আর সেই সঙ্গে চলত শেখা। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখত। মারিয়া বিশ্বাস করতেন শিশুর মন স্পঞ্জের মতো ও জল শুষে নেওয়ার মতো। শিশুমন হলো "বিশোষক"। শেখার পরিবেশ পেলেই সেই মন শেখার উপকরণ খুঁজে নেয়। শিশু সৃষ্টি করতে করতে শেখে। শিশুর মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব আর আত্মবিশ্বাস বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন শিশুর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে তারা অবশ্যই শিখতে পারবে। সান লেরেঞ্জোতে এই কাজ শুরু করেন মারিয়া আর তার সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে।

মারিয়ার বৈজ্ঞানিক মন শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে সংগঠিত করে। শিক্ষা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, মারিয়া ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন মারিয়া। সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে এক সুসংগঠিত কাঠামো দেন। মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষণ পদ্ধতিটি রূপায়িত হয় কিছু প্রামাণ্য শিক্ষণ সামগ্রীর সাহায্যে। উপকরণের সাহায্যে তুলনামূলক ধারণা তৈরি হওয়া। পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে উপকরণ পেরিয়ে বিমূর্ত শেখার দিকে এগিয়ে যাওয়া। শিশুর নির্দিষ্ট আচার আচরণ ও পরিস্থিতি অনুসারে নানান উপকরণ রাখা থাকবে। শিশুদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা এই সব উপকরণ ব্যবহার করে নিজেরাই শেখার এক একটা পর্যায় অতিক্রম করবে। আশা করা হয় এই মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে করতে শিশু স্বাধীন হতে শিখবে। তাই মন্টেসরি কাছে নিয়মানুবর্তিতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নয়। ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ম আবিষ্কার করে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ও সেই নিয়মকে অনুসরণ করে- এই আত্ম বা স্বয়ং নির্ভর শিক্ষাচর্চাই মন্টেসরি করে গেছেন। আর যেহেতু মন্টেসরি মানব জীবনে বাল্যকালের গুরুত্ব অনুভব করেন তাই ছোট থেকেই শিশুদের

মধ্যে এই স্ব-নিয়মানুবর্তিতার বোধের বীজ বপনের কথা বলেছেন। নানান বাস্তব – নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে ধৈর্য, যথাযথতার বোধ ও চর্চা করার মতো অনুশীলনীর ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন মারিয়া। তিনি বিশ্বাস করেন যে এর ফলে শিশুদের মধ্যে মনঃসংযোগ বাড়ে, বৌদ্ধিক বিকাশ হয়।

মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতিতে অক্ষম ও বয়স্কদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা জায়গা পেয়েছে। "ছোটদের বাড়ি"-তে বয়ঃসন্ধির শিশুদের সঙ্গে এই বোধের চর্চা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হত। মারিয়া মন্টেসরি শিক্ষাভাবনায় জীবন রহস্যের প্রতি এক মুক্তমনা সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। মাইক্রোস্কোপের লেন্সের ভিতর দিয়ে কোন একটা জৈবিক অংশ দেখতে দেখতে পর্যবেক্ষকের মন নিজের মধ্যে প্রাণের খেলা চলছে তাতেই মেতে ওঠে। তাই মন্টেসরি প্রণীত শিক্ষণ সামগ্রীগুলো এমন হবে যেগুলো তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির হাত ধরে ধরে পড়ুয়াকে বিমূর্ত বোধের দিকে নিয়ে যাবে। এই ভাবে পড়ুয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি তৈরি হবে। শিক্ষণ সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি গঠনে পরিবেশও বড় ভূমিকা পালন করে। মারিয়া মন্টেসরি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের উপর। এই সামর্থ্য ও শিশুর বিশোষক মন উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিকশিত হয়। মন্টেসরির কাছে একজন ব্যক্তির শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার অর্থ হলো পরপর একাধিক বেশ কয়েকটি জন্ম নেওয়ার মতো ঘটনা। এই ক্রমান্বয়ে শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার পথে রয়েছে প্রচুর দূর্বলতা আর অজানা বাঁক। শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যক্তি মানুষের এই বড় হয়ে ওঠার চলাকে সুগম করে। মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা ভাবনা হলো তত্ত্ব আর চর্চার এক অপূর্ব মিশেল। তাঁর এই তত্ত্ব চর্চার দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর চর্চা ভিত্তি পেয়েছে বৈজ্ঞানিক নীতির সাহায্যে। তাই বোধহয় মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতি এত সার্বজনীন মান্যতা পেয়েছে, গৃহীত হয়েছে।

কেন সংস্কৃতির চর্চা

দশজনকে নিয়ে গান গাওয়া, নাটক অভিনয় করা, কবিতা শুনিয়ে বা অন্য নানাভাবে খুশি করা মন্দ কাজ নয়। মানুষ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকে না, তার প্রাণের আরও নানা তাগিদ আছে। এই জন্য আনন্দের একটা দিলখোশ ভূমিকা আছে এবং থাকবে সন্দেহ নেই। তা নিয়ে বিতর্ক থাকার কথা নয়। মুশকিল হচ্ছে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতিচর্চা বলতে এই সাধারণ ধারণাই সমাজে কমবেশি প্রতিষ্ঠিত। প্রাণের সাথে প্রাণের যোগ ঘটানোর কাজটাই সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কাজ। কেন আজকে এ বিষয়ে জোর দিতে হবে, কারণ আজকের সভ্যতা মানুষকে আর্থিক জীবে পরিণত করেছে। অর্থ ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাবতে পারি না, পুরোটাই বাজার-নির্ভর সংস্কৃতি। তাই তো হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, ক্ষমা, সহানুভূতি। টাকার পেছনে সবাই দৌড়চ্ছে, আরএই পথ ধরে ক্রমশ বাড়ছে মানুষের প্রতি মানুষের বিচ্ছিন্নতা। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে আত্মিক যোগের একটা ভূমিকা আছে সেটা আমরা ভুলতে বসেছি। মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। সভ্যতা একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ক্রমশ। এক বিরাট সংকট ঘনিয়ে আসছে।

অন্যদিকে সংস্কৃতি মানুষকে বদলায়, আমাদের রূপান্তর ঘটায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকে কমিয়ে আনে। সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের যে রূপান্তর হয় তার মধ্যে দিয়ে মানুষের বিকাশ ঘটে। যিনি সংস্কৃতির সরাসরি চর্চা করেন, তিনি যেমন চর্চা বা সাধনার মধ্যে দিয়ে বদলে যান, তেমনি সংস্কৃতির সংস্পর্শে অন্যদেরও রূপান্তর ঘটে। মনে রাখতে হবে এই বিকাশ আপনাতেই ঘটে না। একটা আনন্দের পরিসর তৈরি করতে হয়। গ্রামে, সংসদে, পাড়ায় পাড়ায় যে সাংস্কৃতিক কাজে আত্মমগ্ন শিল্পীরা আছেন, তাঁদেরকে একসাথে করে সেই ভাবনায় কাজটা শুরু করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের বুদ্ধি-বোধ-আবেগ, ভাব, চিন্তাসহ মানুষ তার সকল বৃত্তি নিয়ে যখন জেগে ওঠে তখনই সেটা হয়ে ওঠে আনন্দ। সেই স্বাদ যখন মানুষ পায় তখন তার রূপান্তর ঘটে, সে আর তখন আগের মানুষ থাকে না, নিজের মধ্যে নিজের বিকাশ বোধ করে মানুষ। আজকে আমাদের অন্তরের দরজা খোলা রাখার কথা, সেটা আমরা উল্টে পেরেক মেরে বন্ধ করে রেখেছি। সেই দরজা ভেতর থেকে খোলা যায় না, বাইরে থেকেও নয়। নিজেদের হৃদপিন্ডের ওপর নিজেরাই খিল দিয়ে বসে আছি। পশ্চিমকে আদর্শ ধরে নিয়ে নিরন্তর অনুকরণের চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাস আর আমাদের ইতিহাস তো এক নয়। তাছাড়া আমাদের স্বার্থের সঙ্গে পশ্চিমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থের সংঘাত আছে। আমাদের পথ তো আমাদের নিজেদেরই তৈরী করতে হবে। আমাদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পথ, নিজেদের সংস্কৃতির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের পথ নিজেরা স্থির করে নিতে হবে। পশ্চিম দাবী করছে তার সংস্কৃতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। এটাই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ, আর অন্য সকল সংস্কৃতি "অসভ্যতার" স্তর পেরোয়নি, "আধুনিক" হয়ে ওঠেনি। অতএব অন্যরা সভ্য নয়। এই প্রক্রিয়াকে আমাদের রুখতে হবে। আমাদের যে অমূল্য ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে তাকে নবীকরণের মধ্যে দিয়েই রক্ষা করতে হবে। আজ দুনিয়ায় স্বার্থবুদ্ধি এতটাই প্রবল হয়েছে যে, নিজের খুঁটি যদি নিজেরা শক্ত না করি, যদি শক্ত হাতে খুঁটি না ধরি, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তাই মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠার জন্যই আজকে সাংস্কৃতিক চর্চাটা খুবই জরুরী। তাই আমাদের কাছে সংস্কৃতিচর্চার পথ সরু গলি নয়, প্রশস্ত রাজপথ হয়ে উঠুক। সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াস আজ সীমিত আছে অল্প মানুষের মাঝে, আশা করা যায় ক্রমে তা বিস্তৃত হবে বহু মানুষের চেতনায়।

লোকায়ত সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ভাবনা

"শিক্ষা বলিতে কতগুলি শব্দ শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে।"
-স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমানে আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আছি তা মূলত গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের গোড়াতেই ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে। এদেশের উপর ব্রিটিশ অধিকার কায়েম রাখার জন্যই ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হয়।পুরোপুরি পশ্চিমি মডেলে এদেশে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন গ্রান্ট, মেকলে। এজন্য তাঁরা চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাবে ভাবিত ও অনুগত এক শ্রেণীর প্রজা তৈরী করতে, যারা এদেশে ইংলন্ডের স্বার্থ বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের এতখানি মজ্জায় ঢুকে গেছে যে আমাদের একটা দেশজ লোকায়ত শিক্ষাধারা ছিল, সে কথা আমরা ভুলেই গেছি। এখন প্রশ্ন , তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে? মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে গেছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে মানুষ। মূল্যবোধের ভাঙন দেখা দিচ্ছে। সমাজের প্রতি কোন দায় নেই। আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই, সব এক ধাঁচে বাঁধা। এক ঘেয়েমি সিলেবাস, ছাত্রছাত্রীরা কোন আনন্দ পায় না, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। মানুষ যা জানতে চায় ও শিখতে চায় তার সাথে কোন মিল নেই। ফলস্বরূপ আজকে আমরা গ্রামবাংলায় দেখি যুবকরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে, স্থানীয় এলাকা ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। কারণ ছেলেমেয়েরা যা শিখছে তার বাস্তব প্রয়োগ গ্রামে নিজেদের এলাকায় করা সম্ভব নয়।

নিজেদের সমাজের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নাকি পরীক্ষায় ভালো ফল করা, কোনটা গ্রহণ করবে এনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে সংশয় দেখা দিচ্ছে। যদি আমরা নতুন পথ না বার করতে পারি তাহলে গ্রামসমাজের বাঁধন আরও আলগা হবে। পণ্য-অর্থনীতির বাঁধনে বাঁধা যে সমাজ আজকে আমাদের সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে, সেখানে আত্মীকরণের একটা চেষ্টা চালাতেই হবে আর সেই চেষ্টা চালাতে গেলে লোকায়ত সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়েই এ পথের সন্ধান আমরা পেতে পারি। কীভাবে পেতে পারি তার একটা দিশা আমরা তুলে ধরেছি। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের বাইরে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের পড়াশোনার বাইরে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য খেলাধূলা, কবিতা, নাটকচর্চা, গানবাজনা, ছবি আঁকা, বিতর্কসভা এগুলো হতে পারে। হতে পারে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের যে স্বশাসিত ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ পঞ্চায়েতি রাজ, সেটা জানতে পারে বাল পঞ্চায়েত গঠনের মাধ্যমে। গ্রামের যে চাষ ব্যবস্থা আছে, যা হাতে কলমে শিখতে পারে অর্থাৎ ভোকেশনাল বা পেশাগত কাজ শেখা, তাহলে অন্তত ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের মাটি, বীজ, গ্রামের সম্পদকে বুঝতে শিখবে। স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা করবে, গ্রামের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটা নাড়ির টান তৈরী হবে। শহরের দিকে তাদের আকৃষ্ট হওয়া অনেকাংশে কমে যাবে এবং তাদের জীবনের চলার পথ তারা নিজেদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের একটা আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে-খালি বই পড়া শিক্ষা হলেই হবে না, যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই রকম শিক্ষার প্রয়োজন।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের
কাছে কিছু চাইলে পায় না। জলদান, বিদ্যাদান
সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে।
এখানেই দেশ গভীর ভাবে আপনাকে হারিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রাসঙ্গিকতা

নবদিশা উদ্যোগের একটি প্রধান স্তম্ভ হিসাবে গ্রামীণ – শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় প্রচলিত গ্রামীণ সংস্কৃতির চর্চা এবং প্রসার আজ খুব সামান্য পরিসরে হলেও বিদ্বজনদের একাংশের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও চারিদিকে রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী অধিকার ভাবনার ম-ম গন্ধ এই শান্ত – সুনিবিড় উদ্যোগকে সামনে আসতে দেয় না, তবু শুভ চিন্তা শুভ কর্ম পথে নির্ভয় যাত্রা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা ডানা মেলবেই।

নবদিশার তাত্ত্বিক ভাবনায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলির নিরন্তর চর্চা এবং সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের আরো সমৃদ্ধ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী অনুশীলন। আমরা গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের স্থানীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নতুন চেতনায় অভিষিক্ত করি, যাতে সে প্রকৃত সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পারে এবং বল্গাহীন অবক্ষয়ের মধ্যেও মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তার গ্রামীণ মানচিত্রে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে। তাই খুব ছোট পরিসরে হলেও এই কাজের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতে আমরা সাথে নিয়েছি স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এবং এই পঞ্চায়েতের সাথে ও তার মাধ্যমে কাজ করা শুধুমাত্র প্রশাসনের মধ্য দিয়ে কিছু ন্যস্ত দায়িত্ব 'হাসিল' করে নেওয়ার জন্য নয়, বরং আমাদের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসার মধ্যে নিহিত রয়েছে উন্নয়নের বিকল্প ধারার প্রেক্ষিতে স্থানীয় দরিদ্র মানবসত্তার জাগরণের প্রশ্নটি। এই জাগরণে মানুষের একমাত্র নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠান হতে পারে পঞ্চায়েত।

এই ভাবনার মধ্য দিয়ে আমরা যখন 'নবদিশা' ভাবনার সম্প্রসারণ শুরু করি, তখন এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, যে স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ এবং সংরক্ষণে পঞ্চায়েতকে সক্রিয় এবং তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে সামনে এগিয়ে আসতে হবে, তাই মাঠ-স্তরে আজ যে উদ্যোগগুলি বাংলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবহমান, সেখানে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে শুরু করা হয়েছে এই অনুশীলনের কর্মকাণ্ড। এখানে নজর রাখা হয়েছে যাতে স্থানীয় মেধাবী অথচ বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অপরিচিত মানুষেরা, যাঁরা সাংস্কৃতিক অনুশীলনে লিপ্ত আছেন, তাঁদের জন্য জায়গা যেন উন্মুক্ত থাকে। তাই ছৌ বা জারিগান যাই হোক না কেন, আমরা শিশুদের প্রশিক্ষিত করে তুলছি এই সব ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে। যে পঞ্চায়েত হয়তো তার সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সত্ত্বেও দূরে চলে গিয়েছিল, তা আবার ফিরে আসছে নিজের মহিমায়। তাই আজ পলাশবনে নতুন ছৌ-প্রশিক্ষিত কিশোরের অনুশীলন দেখতে আসে গ্রাম সংসদের সদস্য। তিনি ভাবতেই পারেন না তার সংসদেই হয়তো তৈরি হচ্ছে নতুন কোনও বিশ্বমানের ছৌ-শিল্পী। শুধু তাই নয়, যে কিশোর আজন্ম তার গ্রামে পঞ্চায়েত বলতে জেনে এসেছে অস্বচ্ছতা, সেও আজ উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকরাও তাঁদের কৈশোরে ফিরে যান ----- স্মৃতিতে ভাসে শান্ত গ্রামসমাজ, হেমন্তের ধানকাটা হয়ে যাওয়া মাঠ, অল্প কুয়াশা আর রাত্রিব্যাপী মহাকাব্য।

'নবদিশা' বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যখন নাটক অনুশীলন করে, তখন আমরা চোখের সামনে দেখি অনাগত দিনের ছবি, যেখানে আমাদের শিশুরা মাতিয়ে দিচ্ছে শহরের এলিট কেন্দ্রগুলি, যে কেন্দ্রগুলি এতদিন ছিল শুধু পেশাদারবৃন্দের দখলে, সেখানেই যখন এসে পড়ে আদিবাসী প্রান্তিক জনসমাজের নতুন প্রজন্মের শিশুদের প্রতিভার শান্ত কুচকাওয়াজ, তখন তাই হয় ওঠে আমাদের পুরস্কার। যে প্রতিভা হয়তো অবদমিত হয়ে ছিল পরীক্ষা আর সিলেবাসের চাপে, তাকে মুক্তি দিয়েছে পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ। তাই আমরা বিশ্বাস রাখি এই সব শিশুরা যখন সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে, তখন সে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শুধু প্রশাসন হিসেবে ভাববে না, বরং তাকে মনে করবে নিজস্ব মঞ্চ হিসেবে।

এর পাশাপাশি 'নবদিশা'র অনুপ্রেরণা পঞ্চায়েতকেও আরো নতুন অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করছে। তাই যখন আমরা দেখি গ্রামের পুরোনো এবং এখন আর অনুশীলন-প্রদর্শন করতে না পারা লোকসংস্কৃতি চর্চাকারীদের খুঁজে বার করছে পঞ্চায়েত, আমরা তাকেই বলি যৌথ সাফল্য।

আমরা জানি নবদিশার আগামী দিনগুলি বন্ধুর এবং কঠিন। তবু সুচেতনা --- তুমি এক দূরতর দ্বীপ ----এই জীবনানন্দীয় অনুধ্যানে বিশ্বাস রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি সূর্যোদয়ের পথে।

যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন উপার্জনে
আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই
সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গঠন

আমাদের আধুনিক সভ্যতায় বাস্তব কাজকর্ম এত জটিল হয়ে উঠেছে এবং উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এক ধরণের বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে নিজস্ব একধরনের স্কুল গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা জীবনাদর্শ থেকে বিছিন্ন ছিল না, বরং শিক্ষাকে জীবন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হত। তখন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির মধ্যে আত্মিকবোধ জাগ্রত করা। সেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখীঃ শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি (Self-Realisation) এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual Development)। আর বর্তমানে গড়ে উঠেছে এমন স্কুল যা বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায়। তার ফলে মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সবাই টাকা পয়সা দিয়ে জগৎকে মাপছে। মানুষ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক, সে নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত। তাহলে পথ কোথায়? এখন ক্লাসের ভেতরে একটা কাজ হয়, যেটাকে বলা হয় Within Class Activities অর্থাৎ ক্লাসের ভিতরের কাজ, এছাড়া আর একটা কাজ আছে সেটা হল Out of Class Activities, অর্থাৎ ক্লাসের বাইরের কাজ। সেটা কি? সেটা হচ্ছে নানা রকমের সৃজনাত্মক কাজ, যেমন গল্প, কবিতা-আবৃত্তি, ছবি আঁকা, নাটক, গান, খেলাধুলা, ব্যায়াম এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেমন আনন্দ হয়, তেমনই বৌদ্ধিক এবং মানসিক বিকাশ হয়। নিচে ছক দেওয়া হল। শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক/আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা করবে। বর্তমানে যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে শিক্ষা মানবসম্পদ , বস্তুগত সম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় বিকাশ (GNP)।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা (All Round Development)। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development) নয়। শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক আবেগ এবং সামাজিক, আত্মিক/আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিকাশ হতে হবে। অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিকাশের (Intellectual Development) সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, অভিনয়, নাচ-গান, ছবি আঁকা, বিতর্কসভা এইগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম সংক্রান্ত কার্যাবলী (Extra Curricular Activities)। আমরা মনে করি, শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষার্থীর মনের একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর অনুভূতি দূর করা দরকার। অর্থাৎ আনন্দের একটা পরিবেশ এবং মানসিক প্রফুল্লতার জায়গা তৈরী করা দরকার। শিক্ষা তখনই মানবিক হবে যখন জীবনের সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে হবে, আর এই জীবনের বিকাশ সংগঠিত হবে প্রত্যক্ষ জীবন যাপনের মাধ্যমে।

শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজ

মূল শ্রেণী	উদ্দেশ্য	কাজের সাধারণ প্রকৃতি	কার্যাবলী
শরীরচর্চামূলক	দৈহিক ও মানসিক	ব্যায়াম, খেলাধূলা	বিভিন্ন ধরণের নিয়ন্ত্রিত দেহ সঞ্চালন ও বিকাশ, ফুটবল, খোখো, এক্কাদোক্কা ইত্যাদি
বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যাবলী	বৌদ্ধিক, মানসিক বিকাশ ও জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং নৈতিক বিকাশ	সৃজনাত্মক কাজ ও রসোপলব্ধিমূলক কাজ	আবৃত্তি, কবিতা-সভা, গান-নাচ, অভিনয়, সাহিত্যসভা,গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, ছবি আঁকা, হাতের কাজ
সমাজশিক্ষামূলক	সামাজিক বৌদ্ধিক বিকাশ	সমাজ-প্রশাসনমূলক কাজ	স্বায়াত্তশাসন ব্যবস্থা জানা, সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি
বৃত্তিশিক্ষামূলক	উপার্জন করার ক্ষমতার বিকাশ	হাতে কলমে কাজ শেখা	পুষ্টি বাগান, নার্সারী করা, গাছের কলম করা, ঝুড়ি বোনা ও গ্রামের জীবন জীবিকায় যে সকল জিনিস লাগে

শিক্ষার অর্থ

কে কে খুল্লার

লেখক পরিচিতিঃ কে কে খুল্লার হলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক । শিক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় রচিত তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে সুবিদিত। এই প্রবন্ধটি হল তাঁর রচিত The Meaning of Education প্রবন্ধের বাংলা ভাবানুবাদ।

শিক্ষা হল চরিত্র গঠনের একটি অন্যতম পদ্ধতি। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয় সুদৃঢ় মন এবং প্রসারিত হয় প্রখর বুদ্ধি বা মেধা। এপ্রসঙ্গে একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রবাদ হল – শিক্ষা ব্যতীত একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিং ও লেজহীন একটি পশু। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে শিক্ষা ব্যতীত একজন মানুষ পৃথিবীতে বোঝা মাত্র এবং সমাজের বুকে পরনির্ভরশীল বা পরজীবী ছত্রাকের মত। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অহিংস এবং সর্বোপরি শোষণহীন সমাজ ও অর্থনীতির ধারাকে প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি উপায়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষের উদাহারণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষ মানেই তিনি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াবান এমন নয় বা ইউরোপীয় মধ্যযুগের অতি সাহসী নাইটও নয়, বরং একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষ তাঁকেই বলা যায় যিনি মুক্ত মনের মানুষ এবং যিনি এই মহাবিশ্বকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, সেই সঙ্গে স্থান কালের গণ্ডী থেকে যিনি নিজেকে মুক্ত করেছেন বা স্থান কালের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যিনি আবদ্ধ নন। ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় ও দর্শনগত চিন্তা থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় জ্ঞানের যাচাই ও গুরুর প্রতি শিষ্যের বিরুদ্ধতা প্রদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। গুরু-শিষ্য পরম্পরা বা ঐতিহ্যের মধ্যেও দেখা যায় যে গুরুর জ্ঞানদানের বিষয়ের প্রতি শিষ্য নিজের মতামত প্রকাশ করছে। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, যখন গৌতম তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে অষ্টমার্গ (আটটি পথ) অনুসরণ করার কথা বলেন, তখন গুরুর এই নির্দেশকে আনন্দ প্রত্যাখ্যান করেন এবং গুরুর নির্দেশিত অষ্টমার্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। একইরকম ভাবে দেখা যায়, রাজপুত রাজা মান সিং দীন ইলাহি মেনে চলতে অস্বীকার করেন এবং তা সত্বেও সম্রাট আকবরের অধীনে রাজা মান সিং বহাল তবিয়তে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি ঐতিহ্য।

> **একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষ তাঁকেই বলা যায় যিনি মুক্ত মনের মানুষ এবং যিনি এই মহাবিশ্বকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন**

এমনকি সাম্প্রতিককালেও স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস যুবক বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে অন্ধভাবে যেন তাঁকে অনুসরণ করা না হয় এবং শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি সত্য যাচাই করার কথাও বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অন্বেষণ ও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই যাচাই পদ্ধতি ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে একটি অন্যতম শর্ত।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে শিক্ষা হল একজন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানবীয় আচরণের নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ। তিনি আরও বলেছিলেন যে তেমনি ধর্মও হল একজন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। এই ধর্মকে শিক্ষার একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবেও স্বীকার করেন বিবেকানন্দ। ফুটবল নাকি গীতা পাঠ – এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে শিশুদের ফুটবল খেলার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন যে গীতা পাঠ এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তো বাকি সারাটা জীবন পড়ে রয়েছে। আসলে বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যবোধকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুসারে, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির...

রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছিলেন, হে পিতা, সেই স্বাধীনতার স্বর্গে আমার দেশকে জাগ্রত কর। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যেখানে শান্তি বিরাজমান এবং সেই শান্তিময় স্থানে শিক্ষার জীবন্ত বা প্রাণবন্ত চেহারা প্রকাশিত হবে, যা কিনা শান্তিনিকেতন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসেছেন প্রাচ্যে এবং প্রাচ্যকে নিয়ে গিয়েছেন পাশ্চাত্যে, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক অনন্যসাধারণ মেলবন্ধন, যার শিকড় ভারতীয় মাটিতে কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে তা আন্তর্জাতিক।

গান্ধীজীর শিক্ষা নিয়ে ভাবনার পরিসরও অনেক বেশী বিস্তৃত। গান্ধীজী যেমন মুক্ত শিক্ষার ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তেমনি বৃত্তি মূলক শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন, কন্যা সন্তানের ক্ষমতায় ন প্রভৃতি

বিষয়ও গান্ধীজীর ভাবনায় অনেক বেশী স্থান দখল করে রয়েছে। গান্ধীজী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে দোষত্রুটি করলে শিশুদের কি ধরণের শাস্তি দেওয়া উচিত, তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে শিশুদের শাস্তি দেওয়া বা শাস্তি না দেওয়ার বিষয়টি প্রধান নয়, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দোষত্রুটি মুক্ত করা বা সংশোধন করাই হল মূল উদ্দেশ্য এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশুদের সংশোধন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। পরোক্ষে এটা আসলে শিক্ষকেরই শাস্তি এবং এটাই হওয়া উচিত।

গান্ধীজীঃ থিঙ্কিং হ্যান্ড তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের নিজের হাতই সারা জীবন ধরে একজন মানুষের সমস্ত মানবিক ভূমিকা বা কর্মপ্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। মানুষ ও সমাজের বিবর্তন এবং সর্বোপরি প্রাথমিক হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের সামগ্রিক শিক্ষাকে পরিচালিত করছে এই থিঙ্কিং হ্যান্ড। গান্ধীজী এই শিক্ষাকে "একের মধ্যে অনেক" হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বিদ্যালয়গুলিতে চরকায় সুতো কাটা কে আবশ্যিক করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি পুঁথিগত শিক্ষারও বিরোধীতা করেছিলেন। গান্ধীজী প্রাথমিক শিক্ষাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হবে এবং নিজেরাই তা সমাধান করতে শিখবে। আর সমাধান করার এই শিক্ষা হবে সম্পূর্ণভাবে অহিংস এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আর এইভাবে যদি শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পায়, তাহলে সত্যি সত্যিই যখন সে নিজের জীবনে প্রবেশ করবে, তখন সে নিজে একদম প্রস্তুত হয়েই জীবনের মুখোমুখি হতে পারবে।

পাঠক্রমের মধ্যে কৃষিকে সংযুক্ত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। গান্ধীজী গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পক্ষেও মত দিয়েছিলেন এবং সেখানে "তালি তালিম" (নতুন শিক্ষা) এর জন্য উপযুক্ত নথিপত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন।

শিশুরা কি ধরণের বই পড়াশোনা করবে তা নিয়েও গান্ধীজী বলেছিলেন যে শিশুরা সেই ধরণের বই পড়বে যেটা আসলে শিক্ষকদেরই পড়া উচিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে শিশুরা অবশ্যই খেলাধূলা করবে এবং তাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিতে হবে তা অবশ্যই হবে মৌখিক। পাঠক্রমের মধ্যে কৃষিকে সংযুক্ত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। গান্ধীজী গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পক্ষেও মত দিয়েছিলেন এবং সেখানে "তালি তালিম" (নতুন শিক্ষা) এর জন্য উপযুক্ত নথিপত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন। তালি তালিম এর বাংলা অর্থ নতুন শিক্ষা এবং গান্ধীজী এটিকেই প্রাথমিক শিক্ষা আখ্যা দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিকল্পনা মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং রাজস্থানে সাফল্যমণ্ডিত হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন যে অমূল্য রতন পেতে গেলে গভীরে ডুব দিতে হবে, শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ালে চলবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের ব্যাখা দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং Eternal Values for a Changing Society গ্রন্থের লেখক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছিলেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা এবং তার যে লক্ষ্য, ধর্মের বিজ্ঞানগত ঐতিহ্যের লক্ষ্যের মধ্যে তার প্রতিধ্বনিই হল ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি শক্তিশালী দিক। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে ধর্ম (Religion) হল গোঁড়ামি থেকে মুক্ত এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর এক অনবদ্য মিশ্রণও। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের যে মিশ্রণ এবং তার যে ঘন সন্নিবদ্ধ রূপ তা বেদান্তের দর্শনকেই নির্দেশ করে। আর বিশেষভাবে বলা যায় যে এই দর্শনেরই সুগঠিত রূপ হল গীতা। বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তাধারা, কর্ম ও দর্শনে এই ব্যবহারিক বেদান্তের দর্শনকেই আধুনিক ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন, তাহলে ভুলটা কোথায়? কেমনভাবে ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তারা নিজেরাই ইতিহাসের কীট হিসেবে পরিণত হলেন? এখন শিক্ষার মানে হল কাগজের পাতায় একটা ডিগ্রী, শিক্ষাদান মানে হল শিক্ষকের দেওয়া নোট অর্থাৎ এখন একটা যান্ত্রিক নিয়মের শিকার এই শিক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা তো শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার নয়। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও ভীষণভাবে অবহেলিত। পেশা গ্রহণের পূর্বে আধুনিক প্রযুক্তিকেও মেনে নেওয়া যায়না, বিশেষত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে এই আধুনিক প্রযুক্তিকে সমর্থন করা যায়না। যদিও শিক্ষাকে বাণিজ্যীকরণের বিরুদ্ধে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেডিক্যাল, টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ক্যাপিটেশন ফী চালু রয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কী, এই ক্যাপিটেশন ফী এর প্রচলন আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা। আবার এটাও সত্য যে আমাদের সংবিধানের অষ্টম শিডিউলে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির শিক্ষাদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলির বেশ রমরমা ব্যবসা এবং তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অথচ এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে আমাদের দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ২% মানুষ এই ইংরাজি ভাষায় কথা বলতে পারে ও বুঝতে পারে।

আমরা এই সত্যেরও মুখোমুখি যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে সেভাবে অংশগ্রহণ করেনি। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু কমিটি ও কমিশনও রয়েছে, তবু শিক্ষাকে শ্রেণী কক্ষের ক্ষুদ্র সীমার বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি কেন, তার উত্তর দিতে আমরা আজও অপারগ। তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলে ভুলটা কোথায়?

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন যে অমূল্য রতন পেতে গেলে গভীরে ডুব দিতে হবে, শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ালে চলবে

না। এই বাতাসে ভেসে বেড়ানোর সঙ্গে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে তুলনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে অমূল্য রতন পেতে গেলে শিক্ষা সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে হবে।

শিক্ষাদান করা মানে শুধু জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা নয়, শিক্ষাদান হল আসলে মনের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা এবং ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলা। আমাদের শিক্ষাদর্শন হবে এমন একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে মানবতার সৃষ্টি ঘটবে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের সংবিধানগত অঙ্গীকার ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে যেমন কোন রোগ বা ক্ষুধা থাকবে না, তেমনি কোন বঞ্চনা বা যুদ্ধের হিংস্রতাও থাকবেনা, থাকবে না কোন অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার। এক কথায়, এমন একটা শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে আমাদের গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং চিরন্তন সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারতীয় শিক্ষা দর্শন সব সময়ই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বা অবস্থানের পক্ষে এবং তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও।

এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ভারতীয় শিক্ষা দর্শন সব সময়ই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বা অবস্থানের পক্ষে এবং তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। গান্ধীজী বলেছিলেন যে দরজা জানালা বন্ধ করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ি কামনা করেননা। তিনি কামনা করেন এমন একটা উন্মুক্ত পরিবেশ যেখানে সমস্ত দেশের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত প্রবাহ প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু তা যেন তাঁর পা কে মাটি থেকে উড়িয়ে নিয়ে না যায়। দাবা খেলার সঙ্গে তিনি তুলনা করে বলেছিলেন যে দাবা এমন একটি খেলা যেখানে রেফারীর প্রয়োজন হয় না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন সেই রকম রেফারীহীন খেলা না হয়ে দাঁড়ায়। বরং শিক্ষা এমনই একটা ক্ষেত্র যেখানে বাঁশি (Whistle) বাজিয়ে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

De-schooling Society এবং Re-tooling Society নামে দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থের লেখক ও খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ইভান ইলিচ আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরায় সজ্জিত (re-orient) করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের প্রথাগত বিদ্যালয়গুলিকে (formal school) প্রথামুক্ত বিদ্যালয়ে (non formal school) উন্নীত করার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে প্রথামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আসলে আমাদের সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসের পাতা খুলে দেখা গেছে যে এমন এমন মুহূর্ত তৈরি হয়েছে যখন পুরনো পদ্ধতিকে পালটে নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আজকের দিনটাও তেমনই একটা মুহূর্ত যখন গোটা দেশ আরও ভাল কিছু পরিবর্তনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। ইতিপূর্বে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি, সে সুযোগ আমরা আমাদের অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এখন আরও যেসব সুযোগ আসছে, তা আর হারাতে চাই না।

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

অতীশ দীপঙ্কর

বাংলা আর বাঙালি বললে কী মনে আসে সবুজ খেত, নদনদী, জলা জঙ্গল, মশা-মাছি, নারকোল গাছ, আম-গাছ, পুলি পিঠে, মাছ-ভাত, দুপুরের ভাত ঘুম, গড়িমসি, দেদার আড্ডা - আরো কত কি!

যদি বলি এক বাঙালি সমুদ্র পেরিয়েছিলেন, বরফ ঢাকা হিমালয় পেরিয়েছিলেন এবং তাও আবার হাজার বছর আগে। বিশ্বাস হবে? যদি বলি, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, মাস্টারমশাই। শিক্ষার খোঁজে, শিক্ষা পৌঁছে দিতে দেশ-গ্রাম ছেড়েছিলেন। হ্যাঁ এমনটাই হয়েছিল। হাজার বছর আগে। ১০৫৪ সাল - তিব্বত দেশের ঞেথাও শহরের কোলে এক বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির ঘরের বিছানায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এক বৃদ্ধ। ইনিই সেই বাঙালি মাষ্টার। ৭২ ছুঁইছুঁই বয়স। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। পায়ের কাছে বসে রয়েছে তিব্বতি শিষ্য ডোম তান পা। প্রিয় প্রভু 'জোবো জে'-র (বাংলা ভাষায় মহাপুরুষ) কথা শুনছে সে প্রাণ দিয়ে। বড়ই ক্ষীণ সুরের কথা বলছেন মাষ্টার মশাই। বলছেন ভালো ভাবে বাঁচার পথের কথা, অন্যের ভালোর জন্য জীবনভর কীভাবে বাঁচা যায় তার কথা। শিক্ষা তো তাই–ই দেয়। সবাই মিলে সুস্থভাবে বাঁচার পথ দেখায়। আর শিক্ষক তো শিক্ষার মাধ্যমে সেই পথেরই হদিশ দেন। গত বারো বছর তিব্বত দেশটা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। গ্রামে গঞ্জে, শহরের প্রতিটি ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে কথা বলেছেন মানুষের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের আদর্শ। ভালোভাবে জীবনধারণের উপায় বলেছেন। ভালো ব্যবহারের পথ দেখিয়েছেন। বলেছেন সেই ধর্মকথা যা মনের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, মানুষে মানুষে রেশারেশি দূর করে। সারা তিব্বত জুড়ে অনেক শিষ্য তাঁর। বই লিখিয়েছেন, অনুবাদ করিয়েছেন অনেক পুঁথিপত্র। এমনকি রোগ চিকিৎসা আর সেবা নিয়ে তার বই রয়েছে। কীভাবে সব্বাই মিলে একে অন্যের কষ্টকে দূর করে, সুস্থ ভাবে বাঁচা যায় তার কথা বলে বেড়িয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর এই শিক্ষা। সেটাই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিব্বতের ঘরে ঘরে।

৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ। আজ থেকে এক হাজার বত্রিশ বছর আগেকার বাংলা। সেই বাংলার বিক্রমপুরের ব্রজযোগিনী নগর। সেই নগরে রাজার বাড়ি। আর এই রাজবংশে জন্মেছিলেন তিব্বতের সেই শিক্ষাগুরু। নাম ছিল তার চন্দ্রগর্ভ। রাজার ঘরে জন্মালেও রাজা হতে চাননি। "আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে" – এই ভেবে বেরিয়ে পড়েছিলেন শেখার জন্য। নানান শাস্ত্র, গুরু ঘুরে বৌদ্ধধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করে। ক্রমশ তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহান পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং নাম নেন দীপঙ্কর। তিব্বতে তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর। বৌদ্ধশাস্ত্র শিখতে তখনকার ভারতের পূর্বদিকের সব বৌদ্ধরা বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে বলা হতো বিহার) গেছেন। এমনকি দেশ পেরিয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে ইন্দোনেশিয়া সুমাত্রায় গেছেন - শুধু মাত্র শিখতে, জানতে। দেশে ফিরে এসে বৌদ্ধশিক্ষার প্রচার শুরু করেন। এমন সময় ডাক আসে তিব্বত থেকে। তিব্বত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করলেও এখানে তা সঠিক ভাবে পালন করা হতো না। তিব্বতে তখন ধর্মের নামে চলছিল অনাচার, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের চর্চা। দেশটা উচ্ছৃঙ্খলতা আর গা–জোয়ারিতে ভরে গেছিল। তখন সময়টা ১০৪০ খৃষ্টাব্দ। ডাক পাঠালেন তিব্বতের ঞারি প্রদেশের রাজা –" মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে এসে দেশবাসীকে রক্ষা করুন, পথ দেখান"। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর পাড়ি দিলেন তিব্বতের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিলেন পুঁথিপত্র আর দোভাষী এক সঙ্গী। পাহাড়ি দুর্গম পথ ধরে পৌঁছালেন তিব্বত। ভারতের সীমান্ত পেরোচ্ছেন। জ্ঞানী দীপঙ্করের পথে পড়ল তিনটে কুকুর ছানা। পুঁথিপত্রের সঙ্গে তারাও স্থান পেল। আচার্য দীপঙ্করের সঙ্গে ওই প্রজাতির কুকুর পৌঁছে গেল তিব্বত দেশে। অতীশ দীপঙ্কর মারা যান ঞেথাও মন্দিরে। রেখে যান তাঁর শিক্ষা – মানবতার শিক্ষা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। "কখনো নিজের জন্যে কিছু করবে না; এমন কী নিজের জন্য বাড়িয়ে যাবে না পুণ্যের সঞ্চয়"– তাঁর কথাটি মনে রেখেছেন তাঁর শিষ্যরা। তিব্বত জুড়ে তাঁরা অতীশের ভাগ করে নেওয়া শিক্ষার চর্চা করে চলেছেন।

মানুষের বস্তু জগতের উপর আপন বুদ্ধি কৌশল বিস্তার করে নিজের জীবন যাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নভেম্বর ১৫, ১৮৭৫
জুন ৯, ১৯০০

বিরসা মুন্ডা

বিরসা মুন্ডা আর তার উল্‌গুলানের (বিদ্রোহ) কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হয় কেন বিরসাকে নেতা হতে হয়েছিল। কেন তাঁকে মুন্ডা জীবনে বদল আনার কথা বলতে হয়েছিল ? ছোটনাগপুরের রাঁচি – সিংভূম – পালামৌ অঞ্চল জুড়ে বাস করত আদিবাসীরা – মুন্ডা, ওরাওঁ, লোধা, সাঁওতাল। তাদের মধ্যে মুন্ডাদের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চল পাহাড় – টিলা – বন – জঙ্গল – নদী দিয়ে ভরা। আর বন – জঙ্গলের গাছপালা – ফল – মূল – কন্দ কাঠ মধু বেচে পশু পাখির মাংস খেয়ে মুন্ডাদের জীবন চলে। আমরা জানি যে মানুষের ইতিহাস মানেই দমন-পীড়নের ইতিহাস আর তার প্রতিবাদের ইতিহাস। এই সাধারণ, সরল জীবনে ব্যস্ত থাকা আদিবাসীঃ মুন্ডা, কোল, সাঁওতালদের উপরও যুগ যুগ ধরে নেমে এসেছে নির্যাতন, দমন পীড়ন। ভারতে ইংরেজ শাসন বলবৎ হলে তারাও আদিবাসীদের বিশেষ করে মুন্ডাদের ছেড়ে কথা বলে না। জমিদার – রাজা – ঠিকাদার মহাজনেরা তো অত্যাচার অবিচার চালাত। ইংরেজদের হাত ধরে তাদের শোষণ আরো বেড়ে গেল। এই অঞ্চলে মাটির তলায় প্রচুর খনিজ – লোহা, তামা, কয়লা, অভ্র খনিজের লোভে খনিমালিক, কারখানার মালিকেরাও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দখল নেয়। ইংরেজ সরকারসহ সবধরণের ক্ষমতাবানদের আক্রমণে মুন্ডাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জমিজমা হারিয়ে তারা তখন হতদরিদ্র। মহাজনদের কাছে ঋণে বাঁধা পড়েছে, তাদের সবাই। বছর বছর বিনা পয়সায় বেগার খাটার বেঠবেগারি প্রথা চালু হয়েছে। বড়লোকেদের দমন-পীড়নে মুন্ডাদের নিজস্ব ধর্ম–সংস্কৃতি ছিন্ন ভিন্ন। ইংরেজদের হাত ধরে গ্রামে ঢুকে পড়েছে মিশনারিদের দল। অনেক মুন্ডা ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে যে মুন্ডাদের আদি ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিচু। সরকারি সুবিধা পাওয়ার আশায় আর পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যও অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছে। শিল্পপতিরা বড় বড় কারখানা বানিয়ে আদিবাসীদের কুলি বানিয়ে ছেড়েছে। নিজেদের অঞ্চলের খনিজ বিক্রিতে তাদের অধিকার নেই। জমি হারানো, কাজ হারানো গরীব, আদিবাসী মানুষগুলোকে আড়কাঠিরা ভুলিয়ে ভালিয়ে চা-বাগানে কুলির কাজ করতে চালান করেছে।

আর ঠিক এই সময় বিরসা জোয়ান হয়ে উঠেছে। বোহোনডার ছাগল চড়ানো ছেড়ে, চালকাদ (জন্মভিটা) ছেড়ে চলে যায় জার্মান মিশনারি স্কুলে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা সর্দারদের বিদ্রোহের কথা। মুন্ডা জাতি তখন ছেয়ে আছে কবে আবার তাদের মধ্যে এক নেতা জন্মাবে, যে তাদের জাতিকে ফিরিয়ে দেবে মুন্ডা জাতির হারানো সম্মান, আত্মমর্যাদা !

নিজের চারপাশের দুর্দশা দেখে মনে মনে বিরসা সংকল্প করে। সংকল্প করে যে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে-জঙ্গলে-গ্রামে মুন্ডারাজ ফিরিয়ে আনবে। বিরসার সঙ্কল্পে ইন্ধন জোগায় ইংরেজদের জঙ্গল আইন। যে আইনে আদিবাসীদের থেকে তাদের জঙ্গলের প্রতি অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আদিবাসীদের হাত থেকে বন-জঙ্গল-কাঠ-মধু-ফল-মূল সংরক্ষণ করতে হবে। বন হয়ে যাবে সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু আদিবাসীদের কাছে বন-জঙ্গল হলো মা। গাছ হলো দেবতা। বিরসা জ্বলে উঠলো। বিরসা মুন্ডাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলল এক নতুন ধর্ম যা আত্ম সম্মানের কথা বলে, মুক্তির কথা বলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই-এর কথা বলে, জমিদার-জোতদার-ঠিকেদারদের বিরুদ্ধে তীর ধনুক তোলার কথা বলে।বিরসা নিজে খ্রীষ্টান মিশনারি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুঝেছিল মুন্ডাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, মদের নেশা থেকে মুক্ত করতে হবে। ইংরেজ সরকার গ্রামে গ্রামে মদের দোকান খুলেছিল। মুন্ডাদের মধ্যে, আদিবাসীদের মধ্যে নেশার ঘোর ভাঙ্গাতে হবে। বিরসা তাঁর টাঙ্গি, বল্লম, তীর-ধনুকের ঝংকার দিয়ে মুন্ডা জাতির মনে সাহস জুগিয়ে ছিল – ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার। কুড়ি বছর বয়সে সে মুক্ত মুন্ডা-রাজত্বের স্বপ্ন দেখে। তার বীজ বপন করে আপামর মুন্ডার মনে। তাঁর স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ে মুন্ডাদের গ্রামের পর গ্রামে। জমিদারদের বেগার খাটা ছেড়ে, খাজনা দেওয়া ছেড়ে মুন্ডারা দলে দলে আসে বিরসার কথা শুনতে। দলে দলে খ্রীষ্টান মুন্ডারা গির্জা ছেড়ে মুন্ডাদের আদি ধর্মে-ফেরত আসে। ইংরেজ সরকার জমিদার-ঠিকেদারদের সাহায্যে বিরসাকে গ্রেপ্তার করে। বিনা বিচারে দুই বছরের জেল হয়। বিরসা ছাড়া পায় দুই বছর পর। দ্বিগুণ মাত্রায় তাঁর বিদ্রোহের প্রস্তুতি বেড়ে যায়। মুন্ডা গ্রামে নেমে আসে পুলিশি শাসন। বিরসা তার দলবল নিয়ে পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকে উল্‌গুলানের বার্তা পাঠায়। গ্রাম ছেড়ে মুন্ডা পুরুষ-নারী লড়াই-এ নেমে পড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ইংরেজ পাদ্রী-মিশনারি-পুলিশ-জোতদার-জমিদার। ইংরেজ শাসক পাহাড়ে-বনে-গ্রামে পুলিশ সৈন্য নামায়। তীর, ধনুক, পাথর দিয়ে মুন্ডারা লড়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে। রেল টেলিগ্রাফ, সৈন্য সামন্তের তুলনায় বিরসা আর তাঁর দলের শক্তি ছিল সামান্য। পাঁচ বছর ধরে চলে বিরসার উল্‌গুলান। পঁচিশ বছরের বিরসা আর তার দল গ্রেপ্তার হয়। অবশেষে জেলেই মারা যায় বিরসা। মুন্ডাদের উপর নেমে আসে সরকারি নির্যাতন।

কিন্ত মজাটা হলো ইংরেজ বিরোধী ইতিহাসে বিরসা মুন্ডা আর তাঁর দলের বিদ্রোহ স্থান পেয়ে যায়। দেশপ্রেমের ইতিহাসে বিরসার নাম লেখা হয়ে গেল। আদিবাসী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ে, হাতিয়ার ওঠায়, ঐক্যবদ্ধ হয়, বিরসা মুন্ডার উল্‌গুলান এগিয়ে যায় আরো কয়েক কদম। বিরসার স্বপ্ন সার্থক হয়।

গুরুসদয় দত্ত

মে ১০, ১৮৮২
জুন ২৫, ১৯৪১

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের আই. সি. এস. অফিসার গুরুসদয় দত্ত। এক দিকে তাঁর স্বাধীনচেতা মন, প্রখর দেশাত্মবোধ, অথচ চাকরি করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অধীনে। একদিকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক, অন্যদিকে এক দৃঢ়চেতা সমাজকর্মী। কী করে মেটাতেন এই দুই মেরুর বৈপরীত্য ? ১৯২৮ সালে হাওড়ার বামনগাছিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছিল একদল মানুষ। অ-হিংস জমায়েত। থানার ব্রিটিশ অফিসার গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই বামনগাছি ফায়ারিং কেস সুবিদিত। গুরুসদয় দত্ত সেই সময় হাওড়ায় দায়িত্বে আছেন। জেলার উচ্চপদস্থ অফিসার তিনি। ওই ব্রিটিশ অফিসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইংল্যান্ডের হাউস অফ লর্ডসে এই নিয়ে ঝড় উঠল। "কি! বাঙালি আই. সি. এস. অফিসারের সাহস ব্রিটিশ পুলিশকে প্রশ্ন করা!" গুরুসদয় দত্ত বদলি হলেন ময়মনসিংহ জেলায়। এখানেও উচ্চপদে আসীন হলেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই শুরু হলো গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন – লবণ আইনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গুরুসদয় দত্তকে আদেশ দিলেন আন্দোলন স্তব্ধ করতে। গুরুসদয় দত্ত হাত গুটিয়ে থাকলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেন না। টেলিগ্রামে নির্দেশ এলো গুরুসদয় দত্তকে বীরভূমে বদলি করা হয়েছে। টেলিগ্রামের সাহায্যে রাতারাতি আই. সি. এস. অফিসারকে বদলি করার নির্দেশ অভাবনীয়। উচ্চপদস্থ আধিকারিক অথচ প্রায়ই দেখা যায় সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে মাঠে, ঘাটে, পানা পুকুরে নেমে কাজ করছেন। হাতে কোদাল, বেলচা, ঝাঁটা। অবিভক্ত বাংলার যে জেলায় চাকরিসূত্রে গেছেন, তৈরি করেছেন কর্মীদল । যারা প্রয়োজনে খরা, বন্যাত্রাণে এগিয়ে এসেছেন। যেখানেই জেলা শাসক হিসাবে কাজ করেছেন, সেখানে গ্রাম উন্নয়ন আর সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের সূচনা করেছেন। মেয়েদের পর্দানসীন অবস্থার গ্লানি মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন। স্ত্রী সরোজনলিনী দত্তের সঙ্গে পাবনা জেলায় তৈরি করেছিলেন মহিলা সমিতি। নারীমুক্তি ছিল মহিলা সমিতিগুলির কাজের ভিত্তি। স্ত্রী-র মৃত্যুর পর গুরুসদয় দত্ত স্ত্রীর স্মৃতিতে তৈরি করেন একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র, যেখানে মেয়েদের জন্য হাতের কাজ ও প্রথাবহির্ভূত উপায়ে পড়াশোনা শেখানো শুরু হয়। লোক জীবন নিয়ে পড়াশোনা করা, কাজ করা ছিল গুরুসদয় দত্তের প্রাণের বিষয়। বই লিখেছেন-লোকগান, লোকনৃত্য নিয়ে। লোকশিল্পের নানান নিদর্শন, হাতের কাজ, ছবি, পট, পাথরে খোদাই মূর্ত্তি, কাঠের কাজের জিনিস, পুতুল, এমন কি বাংলার মিষ্টি সন্দেশের ছাঁচ জোগাড় করা ছিল তাঁর নেশা। অবিভক্ত বাংলার রায়বেঁশে নৃত্যকলাটি পুনরুদ্ধার করেন তিনি। এই বিশেষ ধরণের নাচটির ইতিহাস – ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করেন, এছাড়াও ঢালি নাচ, কাঠি নৃত্য, ধামালি – ঝুমুর – ব্রত প্রভৃতি লোকনৃত্যের ধরণগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা যাতে তাদের শিল্পকলাগুলি চর্চা করার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের মানুষেরা যাতে তাঁদের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি – হাতের – কাজ, শিল্পকলার চর্চা করতে পারেন সেই বিষয়ে তিনি আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, উৎসাহিত করে গেছেন। এই ভাবনার সূত্র ধরে ১৯৩১ এ তৈরি করেন "বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি"। ১৯৩৮ এ এই সমিতি বাংলার ব্রতচারী সোসাইটি নাম নেয়। ১৯৩৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা। আসলে ১৯৩২ সাল থেকেই গুরুসদয় দত্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের বীজ। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র হলো জীবনকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত করা। আধুনিক জীবন যেন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি খোপে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। শিক্ষা, কাজ, খেলাধূলা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানান দিকগুলো যেন সম্পর্কহীন, দ্বিখন্ডিত। গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে চাইলেন ব্যক্তি জীবনে সমন্বয় আনতে। ব্যক্তির মন ও শরীরের মধ্যে মিল ঘটাতে। মনের বিকাশ আর শরীর গঠন তাল মিলিয়ে চলবে। লোকনৃত্য এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। লোকগান ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মেলাবে। জীবনধারণকারী পাঁচটি ব্রতঃ জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য আর আনন্দের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিজীবন প্রভাব ফেলবে তাঁর নিজ গোষ্ঠীতে, সমাজে। গোষ্ঠী, গ্রাম, শহর, সমাজ ছাপিয়ে ঐক্য, মৈত্রী সমন্বয়ের এই প্রভাব ছড়িয়ে যাবে দেশে, দেশে। বিশ্ব জুড়ে। বিবিধের মাঝে জীবনের মহামিলন ছড়িয়ে পড়বে। ১৯৪১ সালে কলকাতা সংলগ্ন জোকা অঞ্চলে তৈরি হয় ব্রতচারী গ্রাম ও ব্রতচারী জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের নিজস্ব শিল্পকলা, সংস্কৃতি – নাচ – গান – এর চর্চার হাত ধরে সুস্থ মন ও সু-স্বাস্থ্য গঠনের প্রাণকেন্দ্র। লোকশিল্পের সম্পদ ও সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার দিনে নানান পত্রিকায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আর বেঙ্গল ব্রতচারী সোসাইটির লাইব্রেরীতে সেগুলি রাখা হয়েছে।

"চল কোদাল চালাই
ফেলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।"

কায়িক পরিশ্রমের মান নিয়ে প্রচুর রচনা লিখি আমরা, বক্তৃতা শুনি। পণ্ডিতপ্রবর গুরুসদয় দত্ত হাতে – কলমে কাজ করে তার সত্যতা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন – আমৃত্যু।

১৩৯৮ (ভিন্নমতে ১৪৪০)
১৪৪৮ (ভিন্নমতে ১৫১৮)

কবীর

"পথি পড়ি পড়ি জগ মুয়া
পণ্ডিত ভয়া না কোই
ঢাই অক্ষর প্রেম কা
পড়ে সো পণ্ডিত হয়ে।"

ভীষণ একটা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ – অথচ অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই, নেই তলোয়ার, নেই তীর। ব্যবহার হচ্ছে শুধু শব্দ, বচন, বাণী, দোহা। উল্টো পক্ষে রয়েছে পুঁথি, শাস্ত্র, ধূপ – ধুনো, তাগা – তাবিজ, মন্দির – মসজিদ, পণ্ডিত – পুরোহিত, কাজী – মৌলবী।

১৫০০ শতকের কাশী নগরী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পীঠস্থান। ছোঁয়া-ছুঁয়ি, জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ – নানা ধরণের আচার বিচারে সাধারণ মানুষের জীবন জেরবার। গরীব, নিচু জাতের মানুষেরা স্বস্তিতে নিশ্বাসও নিতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এমন অত্যাচার। অথচ এই শহরের এক কোণে একটি ছোট্ট কুটির। সন্ধ্যে হলেই কুটির প্রাঙ্গণে, সারাদিনের কাজ সেরে, দুদন্ড শান্তি পেতে জড়ো হয় মানুষগুলো। সাধারণ, খেটে – খাওয়া গরীব মানুষ – ছোট জাতের। গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে বসে তারা। কথা শোনে, বচন শোনে। কথা বলছেন, দোহা বাঁধছেন যিনি। তাঁর কথা। কী বলছেন –

"কত মানুষ এলো গেলো
পুঁথি পড়ে পড়ে।
পণ্ডিত হওয়া হলো না।
প্রেম-এর আড়াই অক্ষর
পড়তে জানলেই
পণ্ডিত হওয়া যেত
সে তো আর জানা হলো না।"

সন্ত কবীর এ কী বললেন ? চোখগুলো চক্ চক্ করে ওঠে। দোহা শোনার জন্য বাড়ির সামনে ভিড় বাড়তে থাকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। কবীর জোলা। লহরতালাও – এর পাড়ে ফুটফুটে শিশুটাকে ঘরে আনে নিরু আর নিমা। সেই থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছেন। শিশুর নাম হয়েছে কবীর, মানে মহান। ছোট্ট কবীর বড় হচ্ছেন। জোলারা নিচু জাতের মুসলমান। তাঁত বোনা পেশা। গরীব ছোট জাত। তাই মৌলবী আর কাজীর চোখ রাঙ্গানি দেখে দেখে বড় হচ্ছেন। প্রশ্ন জাগছে মনে। কত রকম ভেদা-ভেদ। হিন্দু-মুসলমান। ছোট জাত – বড় জাত। বড় লোক – গরীব লোক। মানুষ এক হয়েও এত রকম ফারাক? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চললেন। ধর্মশাস্ত্রে নয়। মানুষের মাঝে। হিন্দুত্বকে ছেড়ে, ইসলাম ছেড়ে – "খোঁজার" ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি। মানবজীবনের মানে কী, নিজেকে, ঈশ্বর – খুদা কোথায় – খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। মিশলেন মানুষের সঙ্গে, কথা বললেন। দোহা বাঁধলেন। অস্বীকার করলেন মন্দির মসজিদ – পূজা পাঠ – বেদ কোরান। জীবনযাপনে সহজ সাধারণ আর সৎ - ভালো গুণগুলির চর্চাকে গুরুত্ব দিলেন।

"জাতি না পুছ সাধু কি,
পুছ লিজিয়ে জান
খোল করো তরয়ার কা
পড়া রজনে দো ম্যান।"

বাইরের খাপ – সাজসজ্জা পেরিয়ে অন্তরের প্রাণটাকে খুঁজতে বলেন তিনি। মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে যে ভক্তি আন্দোলন আর সুফী আন্দোলনের স্রোত বইছিল তাতে কবীর জোয়ার আনলেন। সাধারণ মানুষ এই জোয়ারে গা ভাসালেন। মুখে মুখে কবীর রচনা করে চললেন রমৈনী, সবদ, সাখী ! কবীরের বলা বাণীর নানান চেহারা। অবদমিত, অবহেলিত মানুষ খুঁজে পেলেন মুক্তির স্বাদ। মানব জীবনের দৈনন্দিনের কথা এই বাণীতে জায়গা করে নিল। সহজ ভাষায় মানুষ গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পারল। বাইরের আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে প্রাণ-ই যে মহান, কবীর তাই শোনালেন।

নিজেকে জানতে চাওয়া মানেই পাশের জনকে বুঝতে চাওয়া। আর জানা – বোঝার মধ্যে দিয়ে একে অন্যের প্রতি আমরা সহনশীল হই, অ-হিংস হই, মিল খুঁজি, ভেদ ঘুচাই। সাধারণ চাষা-ভুষো, কুমোর, মজুর, শ্রমজীবি মানুষজনের জীবনে আশা – ভরসার আলো জ্বেলে দিয়ে কবীরের প্রাণের আলো নিভে গেল- ১২০ বছরের দীর্ঘ জীবন পার করে মারা গেলেন সন্ত কবীর। রেখে গেলেন অগুনতি কবীর-পন্থীদের। যারা মানুষে মানুষে মিলনে বিশ্বাস করে। মৈত্রী আর শান্তিতে প্রত্যয় রাখে।

সংস্কৃতির অনুশীলন ছাড়া অন্তরের পূর্ণতা সাধন কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশের সংকলন

রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক চিন্তাবিশ্বের বৈচিত্র্যময় ভুবনে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষত শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি যে ব্যতিক্রমী এবং বিকল্প শিক্ষার অনুশীলনে নিজেকে ব্যাপৃত-সম্পৃক্ত রেখেছিলেন, তা আজকের পরিব্যাপ্ত ভাঙন এবং অবক্ষয়ের যুগে শুধু নতুন করে চর্চার দাবি রাখে তাই নয়, বরঞ্চ বর্তমান সমাজ-প্রেক্ষিতে যদি সীমাবদ্ধ পরিসরেও তার প্রয়োগ করা যায়, তবে তাই হবে মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান চিন্তাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম এবং দায়বদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। যদিও শুধুমাত্র কিছু উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনার গভীরতা স্পর্শ করা যাবে এই রকম আশা করা নিতান্তই বাতুলতা, তবু আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এগুলি পাঠ করে শিক্ষক অথবা শিক্ষা পেশাজীবিবৃন্দ মূল প্রবন্ধগুলি চর্চায় এবং তাঁদের প্রতিদিনের কর্মভূমিতে তার প্রয়োগে ব্যাপৃত হবেন। কারণ শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক ধূসরতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সুস্থায়ীত্ব ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এখানে উদ্ধৃত সমস্ত রচনাংশ বিশ্বভারতী প্রকাশিত "শিক্ষা" প্রবন্ধ সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে (ভাদ্র ১৪১৭ সংস্করণ)।

"এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার বিকিরণ

"অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না – বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

"বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্তই আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

"আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদন্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদিবা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

"আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা – আমাদের সুহৃৎ বন্ধু – আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী – আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা – আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল

ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

"মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে -একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।"

প্রবন্ধঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

"সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।"

প্রবন্ধঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

"দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটি এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।"

প্রবন্ধঃ "শিক্ষাসমস্যা"

"পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে – মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয় – তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌স্ট্রাক্ট্ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

"যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

"লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটর রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি এক-প্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

"মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া

বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিক্যাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কী আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল –

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।
হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।"

প্রবন্ধঃ জাতীয় বিদ্যালয়

"শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষাবিধি

"'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্‌সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।"

প্রবন্ধঃ লক্ষ্য ও শিক্ষা

"আমাদের বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।"

প্রবন্ধঃ লক্ষ্য ও শিক্ষা

"আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?"

প্রবন্ধঃ বিদ্যার যাচাই

"শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্‌ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে।"

প্রবন্ধঃ শিক্ষার বিকিরণ

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।

টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদাবিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

প্রবন্ধঃ ছাত্রসম্ভাষণ

উন্নয়নের অতীত ও বর্তমানঃ নতুন পথের সন্ধানে

সমাজের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে, হয়তো চলতেও থাকবে। আসলে সঠিক উন্নয়নের পথটা চেনা অত্যন্ত জরুরী এই মুহূর্তে। তাই উন্নয়নের প্রশ্নে অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে যদি একটু ভাবি, তাহলে বোধহয় ভবিষ্যতের একটা পথ বেরতে পারে। কিন্তু এখন আমরা উন্নয়নের যে মডেলটা দেখি সেটা পশ্চিমি ধাঁচে উন্নয়ন, এটা একটা মডেল বলে অনেক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের মনে হয়েছে। এই মডেলে বর্তমানে যে উন্নয়ন দেখি, মনে হয় তা একটা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার।

চলতি উন্নয়ন ধারণাটা যতই আপাত বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, এর থেকে সব মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়নি, হবেও না। উপরতলার কিছু সংখ্যক মানুষ এর দ্বারা লাভবান হবে বা হচ্ছে, বাদবাকিরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের মূল্যবোধটা ভোগের খাতে বয়ে যায়। যেমন এখন মানুষ চায় উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নত উপার্জন ব্যবস্থা, উন্নত পথঘাট ইত্যাদি। এই সূত্র ধরেই পশ্চিমি মডেলের উন্নয়ন ঢুকে পড়ছে পৃথিবীর দেশে দেশে। উন্নয়নটা যাদের জন্য বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, তাঁরা কিন্তু আদৌ জানেন না উন্নয়ন কি জিনিস, তাঁদের জীবনে তার ভূমিকা কি? উন্নয়ন কর্তারা তাঁদের খোজঁও নেন না। কিসে তাঁদের উন্নতি ঘটবে তাও জানতে চান না। উন্নয়নের যাঁরা নীতি নির্ধারণ করেন, তাঁদের কাছে উন্নয়ন একটা পয়সাকড়ির ব্যাপার, জীবিকা এবং ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। এটা হয়ে যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙ্খা পূরণের উপায়, উচ্চবিত্তে পরিণত হওয়ার দিকে এগোনো। এরা ভেবে দেখেন না যে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য-পরম্পরা, জ্ঞান, উৎপাদন কৌশল কী চালু আছে সমাজে, আর সেগুলো লোপাট করে দেওয়াই যেন বর্তমান উন্নয়নের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান আর উন্নয়ন-পেশাদার বিশেষজ্ঞদের কব্জায় উন্নয়ন বাঁধা, সেখানে সাধারণ মানুষ নীরব দর্শক। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, তাঁদের আবেগ, কোন ধরণের উন্নয়ন হলে স্থানীয় এলাকার ভালো হবে, এসবের কোন ভূমিকা নেই। কী হলে সমাজের মঙ্গল হবে, তা নিয়ে উন্নয়ন-সংগঠন, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন (NGO) কেউ ভাবে না। আর উন্নয়নের নামে মধু খাচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষ। এটা তাঁদের ক্ষমতার উৎসও বটে। মুলত তারাই অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের উন্নয়নের চিন্তাটা স্থানীয় সমস্যার আধারে কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমের প্রয়োজনে, পশ্চিমের আদর্শে ও আগ্রহে উন্নয়ন-চিন্তা বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নয়নকর্তাদের মনে হয়েছে আমরা তাদের মতো নই। সুতরাং আমাদেরকে তাদের মতো হতে হবে। তাদের উন্নয়ন মডেলটাই যেন সঠিক। তাই সারা পৃথিবীকেই এই মডেল অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই মডেল মূলত ভোগকেন্দ্রিক এবং যার পয়সা আছে তার জন্য অফুরন্ত সুযোগ সাজানো আছে। মনে রাখতে হবে, যদি প্রথম বিশ্ব ইউরোপ এবং আমেরিকা যে পরিমাণ ভোগ করে সেই পরিমাণ ভোগের পিছনে যদি বিশ্বের সকলে ছুটতে থাকে, তাহলে এই পৃথিবীর মতো আরও দুটো পৃথিবী লাগবে, তা কি সম্ভব? এই উন্নয়ন আদতে শহরকেন্দ্রিক চোখ ধাঁধানো মডেল। এই মডেলে গ্রামীণ কৃষ্টি, সংস্কৃতি কোণঠাসা, বিপর্যস্ত। সবাই একভাবে ভোগ বিলাসের সুরে কথা বলছে, ভাবছে আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার অর্থ , ভাবছে আমি একাই থাকব। নিজের মতো ভোগ করব। ফলস্বরূপ ভেঙে যাচ্ছে আমাদের যৌথ পরিবার।

মনে রাখতে হবে, গ্রামের নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক চৌহদ্দি আছে। সেই চৌহদ্দির মধ্যেই গ্রামবাসীর অবস্থান।গ্রামবাসীরা সেই সীমানা জানে। সেখানে ওপর থেকে উন্নয়ন চাপিয়ে দিলেই গ্রামের তথা সমাজের উন্নতি হবে না। যেমন গ্রামের একটা নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু ছিল, গ্রাম ষোল আনা। ওপর থেকে একটা পশ্চিমি মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক শাসন চালালে গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব যে একটা স্ব-শাসনের ভূমিকাও রয়েছে, সেটা অমান্য করা হবে। এখন আমরা একটু অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে পারি এবং যেসব মনীষীরা গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন, অনেক কাজও করে গেছেন, নতুন পথ দেখিয়েছেন, তাঁরা কী বলেছেন্, সেগুলো যদি দেখতে চাই, তাহলে সবার আগে যাঁদের কথা মনে পড়ে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। পল্লীসমাজে ব্যক্তি সম্পত্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই, যেখানে ছিল নির্ধন, সেই সমাজে আপন স্থান ও মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামের বিশুদ্ধ জল, বৈশ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজার থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা ও সমাজের ইচ্ছা দুটোই মিলেছিল। এই যে আদান প্রদান চলত, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র যোগে নয়, মানুষের ইচ্ছার মধ্যে এটা ছিল। ব্যক্তিগত অন্তরের দিক থেকে যে সাড়া মিলত সেটাই স্থায়ী উন্নয়নের মানবিক ধাপ ছিল। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। রবীন্দ্রনাথ যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে "মানুষের অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে, কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা, বাহিরের লোভে অন্তরের লোকসান ঘটে, অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয়, বোঝা আমাদের মাথার উপরে"। এখন রাষ্ট্র, যাকে আমরা সরকার বলি, তার দানের উপর আমরা বসে আছি। আর আবেদন নিবেদনের থালা আমরা পেতে বসে আছি রাষ্ট্রের কাছে, রাজনৈতিক দাদাদের কাছে, অসরকারী সংগঠন (NGO)-দের কাছে। আমাদের আত্মশক্তির

বিকাশ ঘটাতে হবে, এটাই উন্নয়নের ভিত। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে লালন অবধি সাধু সাধক যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোন মহাবার্তা নিয়ে, তাঁরা সকলেই যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী, তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা বলে ছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার সাথে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসেবে বিজ্ঞ লোকের মতো এমন কথা বলেননি যে, আগে বাহ্যিক, তারপরে আন্তরিক, আগে অন্ন, বস্ত্র, টাকাকড়ি তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। পশ্চিমি মডেল অনুসরণ করে যে বিপদ আমরা ডেকে এনেছি তা হল এই যে, দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পাওয়া যায় না। জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে। এইখানে দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক যথার্থ সেবার; সেখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শান্তির ফল লাভ করে। তাঁর মতে "চার পয়সা খরচ করে কোন মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনই পাঠাতে পারতো না।" ---যে সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেখানেই সকলের ও প্রত্যেকের কল্যাণ। সমাজের উন্নয়ন তখনই হবে যখন অনেকে মিলে মনের যোগে কাজ করতে পারবে। মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্রে বাস করতে চায়। একলামানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলআনা পেয়ে থাকে। দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারে মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। বর্তমানে উন্নয়ন যে পথে ছুটে চলেছে তাতে সব মানুষই একটা জায়গায় বাঁধা পড়েছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানেই মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই বলেছে সেখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে। কেননা কোনো মানুষ একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ দিয়ে, প্রতাপ নিয়ে মানুষে মানুষে যতই লড়াই ততই প্রবঞ্চনা। অর্থোপার্জন, শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তাহলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। জনকল্যাণের দাবি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের দাবির বিপরীত এবং ব্যক্তিস্বার্থের দাবির চেয়ে উপরের জিনিস। আর আমাদের ভারতবর্ষে সমাজের শাসন প্রবল, রাষ্ট্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, এমনি করেই অন্ন-বস্ত্র, ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এ দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল অংশ মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।পাশ্চাত্য রাজার শাসনকালে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করল। এখানেই শেষ হল সমাজের শাসন। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজন সুলভ্য প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই সকল পাঠশালার অধিষ্ঠান স্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। যার ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরেই ছিল। তখনকার ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভান্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনিভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয়নি, অন্নের অভাব হয়নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয়নি। তাতে আঘাত করল যখন ইউরোপীয় আদর্শে পশ্চিমি মডেলে নগরগুলি দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামীণ সমাজ গেল শুকিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী যেটার উপর জোর দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে সত্য। দারিদ্র্য হোক, মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরের যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে, এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেতে শস্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে, সেই দৈন্যে সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগলে, দেখা গেল সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম করে তবে নিভল । এটি হল বাইরের কথা, ভিতরের কথা হচ্ছে অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো করে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়ে আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধি জীর্ণ হয়। সাহসীকে কাবু করে, সকল রকম কর্মকেই বাধা দেয়। এই জন্যই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না। এই জন্যেই জ্বলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই কেবল হাহাকারেই ক্য মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয়নি। তাই নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হবে। এক জায়গায় এক হবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন খাঁটি লোক, শক্ত লোক যাঁরা আছেন, যাঁরা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন, এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও উৎসাহ হারান না, তাঁদেরকে এক করিতে হইবে।তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে, বর্তমানে উন্নয়ন ভাবনার মূলে রয়েছে তিনটে জিনিস। এক প্রলোভন, দুই একক জীবনের প্রতি মোহ, তিন মুল্যবোধহীনতা। এই তিনটি জিনিস মানুষকে নতুন ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উন্নয়ন তো শুধু অর্থনীতির সাথে যুক্ত নয়। এর সঙ্গে যেমন অর্থনীতির যোগ আছে, তেমনি আমোদপ্রমোদের কথা আছে, আরাম ও সুখের কথা আছে, আছে ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার কথাও।

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষা

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মূল নীতিই হচ্ছে "বিকেন্দ্রীকরণ"। এই শব্দটার মধ্যে জড়িয়ে আছে মানুষের মতামত, সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা এবং তাদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই নীতিটির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই তা বোঝা যায়। তেমনি অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শুধুমাত্র সরকারী শিক্ষা দপ্তরের হাতে আছে বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে তারাই আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকেন্দ্রে থাকে। বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ না করে শিক্ষাকে সমাজ ও পরিবার থেকে গ্রামের স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষা চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে। বহির্জগতের সঙ্গে তার আর কোনও যোগাযোগ ঘটবে না। আসলে দৈনন্দিন জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাবার বড় অস্ত্রই হচ্ছে "শিক্ষা"।

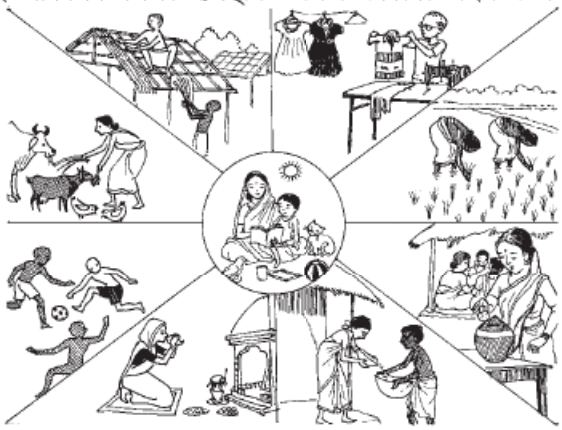

শিক্ষা যে জীবনের সবচেয়ে জরুরী বিষয় সে সম্বন্ধে সমাজের পিছিয়ে পড়া দূর্বল গোষ্ঠীগুলির খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই। শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো তৈরি ব্যয় সাপেক্ষ, তবুও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা যতটা হয় সে তুলনায় আঞ্চলিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বা বিষয় কি হবে সেসব নিয়ে প্রায় ভাবা হয় না বললেই চলে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়েই তৈরি আর সেই সমাজের আঞ্চলিক জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে রাখা দরকার। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটা কে নেবে ? এখানেই কিন্তু আমাদের স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রম ও রাজ্য পাঠ্যক্রমও স্থানীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সমাজেরই একটা অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। তাই অঞ্চলের পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া দরকার সেটা পঞ্চায়েতেরই ঠিক করা উচিত। আঞ্চলিক বিষয় নির্ধারণ করার জন্য সেখানকার স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছে MSK, SSK গুলি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পঞ্চায়েত দ্বারা চালিত হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তুলনায় অনেক বেশি।

আগেই বলা হয়েছে, "শিক্ষা" কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। আবার এটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারও নয়। সমাজ ও জনগোষ্ঠী, পরিবার এবং সেই অঞ্চলের চাহিদার ভিত্তিতেই শিক্ষার বিষয়বস্তু স্থির হওয়া দরকার। আর অবশ্যই দরকার স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের একটা যথাযথ উদ্যোগ।

তবেই শিক্ষার সঙ্গে সমাজের একটা সেতুবন্ধন রচিত হবে। তখনই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার প্রয়োগ সফল হবে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

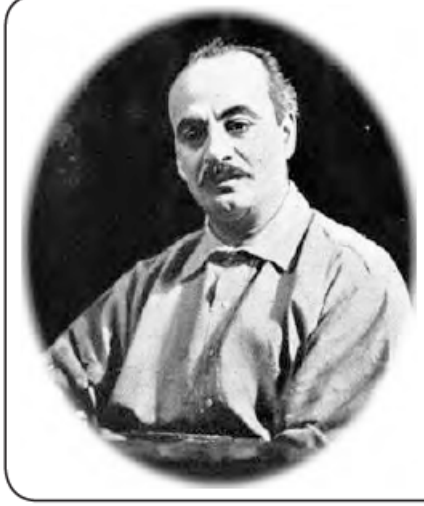

শিশুটি শুধু আপনার একার সন্তান নয়, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের জীবনের অধিকারী। সে আপনার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে কিন্তু আপনার কাছ থেকে আসেনি । যদিও সে আপনাদের সঙ্গে থাকে তথাপি আপনার সঙ্গে বাস করে না ,কারণ তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার জগত আলদা। আপনি তাকে ভালবাসতে পারেন কিন্তু আপনার চিন্তা ভাবনা তার উপর চাপাতে পারেন না। কারণ তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা রয়েছে । আপনি তার শরীরটাকে আশ্রয় দিতে পারেন। তার আত্মাকে আশ্রয় দিতে পারেন না। তার আত্মা আগামী দিনে যেখানে বসবাস করবে, আপনি সেই আগামিদিনের জীবনে কখনও বাস করেননি। এমনকি আপনার স্বপ্নও সেইখানে পৌছতে পারে না। কারণ জীবন কখনো গতকালের সঙ্গে যায় না, সে এগিয়ে যায়।

খলিল জীব্রান

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯
স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বহুজাতিক গণমাধ্যম শাসিত শহরবাসীর মননে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে একধরনের ভয়াবহ নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। যদিও এর সবটাই মিথ্যা এমন নয়। তবু আজও ভারতের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আইনের প্রয়োগের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ণায়ক ভূমিকা সামনে চলে এসেছে। এ বিষয়ে শিক্ষার অধিকার আইন একগুচ্ছ দায়িত্ব আইনি ভাবে পঞ্চায়েতের ওপর আরোপ করেছে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের ৯ নং ধারায় সুবিস্তৃত এবং সহজে অধিগম্য আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে-

প্রথমত: পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব থাকছে এলাকার সমস্ত ৬-১৪ পর্যন্ত শিশুকে শিক্ষা প্রদান করার। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিদ্যালয়ছুট বালক-বালিকাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা।

দ্বিতীয়ত: পঞ্চায়েতকে এই আইনের ৬ নং ধারা অনুসারে Neighbourhood School এর বন্দোবস্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে যে অধিনিয়ম করা হয়েছে সেখানে বিস্তারিত ভাবে অনুপুঙ্খগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার প্রাথমিকের জন্য ১ কিলোমিটার এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য ২ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়াতে পঞ্চায়েতের সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়ত: পঞ্চায়েতকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত শ্রেণীগুলি থেকে আসা শিশুরা কোনও বৈষম্যের মুখোমুখি না হয় এবং এখানে তাদের বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ওপরে নজর রাখতে এই আইন নির্দেশ দিয়েছে।

চতুর্থত: পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এলাকার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর বিষয়ে তথ্য রাখার। শুধু তাই নয় পাশাপাশি তাঁদের হাতে এই দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে যে এই সব শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি ও উপস্থিতি এবং সুস্থ বিদ্যাচর্চার ওপরে পুরো নজর রাখার।

পঞ্চমত: বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষণের উপাদানের মতো বিষয়গুলির দায়িত্বও পঞ্চায়েতের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠত: পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচীর সময়োপযোগী প্রস্তাবনাও স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ দায়িত্ব।

সপ্তমতঃ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা, বিদ্যালয় কি ভাবে চলছে তার দিকে সুনিপুণ ভাবে নজর দেওয়া এবং সর্বোপরি জীবিকার অনুসন্ধানে যেসব গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বার বার স্থানান্তরিত হতে হয়, তাঁদের শিশুদের শিক্ষায় যাতে কোনও ছেদ না পড়ে তার ওপরে দৃষ্টি দেওয়া পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

স্থানীয় জ্ঞানের ঐতিহ্য

ভারতবর্ষ বহু গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ। এই দেশকে বৈচিত্র্যময় পরিবেশের জ্ঞানের ভান্ডার বলা চলে। গোষ্ঠীগুলি তার অঞ্চলের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে চলেছে বংশানুক্রমে এবং পরবর্তী বংশধরদের শিখিয়ে গেছে।ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই জ্ঞান যেসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি হল-বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার স্থানীয় নামকরণ ও শ্রেণী বিভক্তিকরণ বা ফসল সংগ্রহ করা এবং অসময়ের জন্য গোলাজাত করা ও জলসংরক্ষণ অথবা সুস্থায়ী কৃষিকাজের অনুশীলন।এসব বিষয়ে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী যে জ্ঞান দেওয়া হয় কখনও কখনও স্থানীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তার তফাৎ হয়ে যায়।অন্য সময়ে অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞানের তত গুরুত্ব থাকে না। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সাধারণের প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প তৈরী করার ক্ষেত্রে।এর মাধ্যমে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও স্কুলের দেওয়া জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন গাছের প্রজাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে দুধরনের জ্ঞানই গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সমান্তরাল অবস্থায় রয়েছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে, যেমন গাছের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে,স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে বিবাদ দেখা দিতে পারে। যাই হোক,সকল ধরণের স্থানীয় লব্ধ জ্ঞানকেই সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত।

> দেশের মানুষের ও পরিবেশের চরিত্র অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি তৈরি হওয়া দরকার।
>
> - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫'এর প্রেক্ষিতে

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫'এর প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনা নিয়েও অনেক কিছু বলা হয়েছে, যেগুলি নিয়ে এখনও পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের স্তরে খুব একটা আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

শুধু মাত্র পালনীয় কর্তব্যের দিকেই যদি প্রধান জোরটা থাকত তবে এ নিয়ে এত আলোচনার প্রয়োজন থাকত না। এখানে পঞ্চায়েতিরাজ এবং শিক্ষার সম্পর্কটিকে প্রথমবার নির্মোহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাওয়া হয়েছে, দেখানো হয়েছে এই সম্পর্কের পরিসরে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি এবং তাদের চরিত্রগুলি কি ধরণের।

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে, পঞ্চায়েতের সমান্তরালে আমরা এমন অনেক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সম্প্রসারিত করে চলেছি যেগুলির সাথে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পারিক দায়বদ্ধতা একেবারেই স্থিরীকৃত নয়। সেজন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেখানে সম্মিলিত উদ্যোগের সম্ভাবনা খোলা আছে, সেখানে ভালোভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত উদ্যোগ গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫, খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেছে যে ব্লক এবং জেলা স্তরে সুপ্রচুর তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপরে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে এবং এগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিমাণগত মূল্যায়নের ওপরে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রূপরেখা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো বলেছে B.R.C/C.R.C গুলির পরিচালন এবং কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি নিয়ে অনেক কিছু নতুন চিন্তা করার আছে। এখানে রূপরেখা খুব জোর দিয়েছে এইসব সম্পদ কেন্দ্রগুলোর কর্মীদের ভূমিকা নিরূপণ করার ওপরে। এইসব সম্পদ কেন্দ্রগুলির কর্মীদের যদি আরো সক্ষম করে তোলা যায় তবে তারা শুধু বিদ্যালয় ব্যবস্থা নয়, বরং সামগ্রিক ভাবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নে।

রূপরেখা জানিয়েছে শিক্ষাদানের কাজে শিক্ষকদের স্কুলভিত্তিক সহায়তা আরো জোরদার করার জন্য গ্রাম, ব্লক, ক্লাস্টার এমনকি শহরতলীতে যারা তথ্য সরবরাহ করতে পারেন, এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করা খুব প্রয়োজন। নবদিশা এই কাজে ইতিমধ্যে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। রূপরেখা পরামর্শ প্রদান করেছে যে এই সব লোকেরা যাতে নিয়মিত নতুন নতুন তথ্য সম্প্রসারণ করে পাঠদানে নতুন সৃজনের মাত্রা সংযোজন করতে পারেন তার দিকে নজর দিতে হবে এবং সর্বোপরি রূপরেখা বিশেষভাবে পরামর্শ প্রদান করেছে এই সহযোগিতাকে ব্লক এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য। এই প্রাতিষ্ঠানিক সমীকরণ একবার ঘটিয়ে দিতে পারলে এরজন্য অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হবে।

নবদিশা এই সব নীতি মাঠস্তরে সম্প্রসারণে দায়বদ্ধ।

স্কুল স্থানীয় সম্পদকর্মীদের ব্যবহার করতে পারে

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে, বাবা-মা এবং শিক্ষকদের স্কুল শিক্ষার উন্নয়নের স্তরে আঞ্চলিক ঐতিহ্যগত শিল্পকলা ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের উচিত আমাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যকে এক হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচান। শিশুদেরও তাদের চারপাশের অবস্থা এবং পরিবেশের বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার। সমস্ত স্কুলগুলির উচিত তাদের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্থানীয় এলাকার জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ দেওয়া। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শহর, মফস্বল এবং গ্রামাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শিল্পকলা এবং স্থাপত্য আছে যাকে ঘিরে শিশুরা নিজেরাই এলাকার ইতিহাস তৈরী করতে পারে। স্থানীয় শিল্পী, কারিগর বা অভিনেতাদের স্কুলে ডাকা যেতে পারে বা তাদের অল্প সময়ের জন্য নিয়োগও করা যেতে পারে, বিভিন্ন শিল্পকলা শেখানোর জন্য। স্কুলগুলির শিক্ষকদের উচিত তাদের ছাত্র/ছাত্রীদের একটা ছোট্ট লাইব্রেরী অথবা পোষ্টার, বই, চার্ট বা বিভিন্ন অডিও-ভিসুয়াল উপকরণের সংগ্রহশালা তৈরী করতে সাহায্য করা ,যা ছাত্র/ছাত্রীরাই ব্যবহার করবে এবং যত্ন করবে। শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্যে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানোর উপকরণ তৈরি করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ National Council of Educational Research and Training

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার
কিছু সম্ভাব্য খসড়া

(১) মালতীবালা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি সার্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে আগামী তিন বছরে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে তাঁদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন বা জঙ্গল আছে সেখানে গিয়ে তা দেখা এবং নানা রকম পশুপাখি, গাছপালা, পতঙ্গ চেনার ব্যবস্থা করা হবে। তার জন্য দুই জন শিক্ষক মহাশয় ও স্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁরা জঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখি চেনেন তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আরো ভালো করে শিখতে পারে।

(২) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষবাসে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এই পঞ্চায়েতে এখনো চাষী ভাইয়েরা ধরে রেখেছেন তাঁদের পরম্পরাগত চাষ পদ্ধতি। এখনও এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পুরোনো বীজ অনেক চাষী ধরে রাখেন এবং সেগুলো পরিবারের খাবার জন্য ব্যবহার করেন। এই অভ্যাস যাতে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং পুরনো দেশীয় বীজের চাষে এই গ্রামপঞ্চায়েত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তার জন্য এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে পঞ্চম- ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের যেন এই সব চাষী ভাইদের শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিদর্শন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে প্রাকৃতিক দেশীবীজের ব্যবহার এবং রাসায়নিক সার ও বিষের পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষবাসের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। তবে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি যাতে তারা বুঝতে পারে, সেজন্য জেলা KVK র সাথে যোগাযোগ তৈরি করা হবে। এই কাজে মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি এবং প্রাণীসম্পদ বিষয়ক উপসমিতিকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা হবে। এর মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের মনে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার সুস্থায়ী উন্নয়নে পঞ্চায়েতের কী ভূমিকা হতে পারে সে প্রসঙ্গে খুব ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আশা করা যায় এই সব ছাত্রী-ছাত্ররা যখন স্কুল জীবন শেষ করে ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করবে, তখন তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও সমৃদ্ধ এবং সচল করে তুলতে পারবে।

(৩) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩২টি পুকুর রয়েছে, যেগুলিতে সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৩০-৩৫ রকমের দেশীয় মাছের প্রজাতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সব মাছগুলি স্থানীয় মানুষদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এবং জরুরি পুষ্টির উৎস ও পাশাপাশি জীবিকার একটি প্রধান অবলম্বন। বিভিন্ন কারণে এই মৎস্য সম্পদ খুব দ্রুত ক্ষয় পেয়ে চলেছে। এলাকার দুই জন অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাঁরা এই ক্ষয় প্রক্রিয়া প্রতিরোধে অনেক কাজ করছেন। তাঁরা যাতে এলাকার মৎস্যসম্পদের নিবিড়তা এবং তার বৈচিত্র্যের সুস্থায়ীত্ব-সংরক্ষণে পড়ুয়াদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির সম্প্রসারণ-ঘটাতে পারেন তার জন্য বিশেষ ভাবে সুযোগ এবং পরিসর দেওয়া হবে। দীর্ঘ সময়ের ছুটিগুলিতে ছাত্রদের নিয়ে পুকুরগুলির অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা, দেশীয় প্রজাতির মাছের পুষ্টির গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

(৪) মালতীবালা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় কিমি দক্ষিণে প্রায় ছয় কিমি ব্যাপী প্রাচীন শাল অরণ্য এবং কৃষির সমান্তরালে অনেক শিশুর পিতা মাতা শালপাতা সংগ্রহ করার সাথেও যুক্ত। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য অসচেতনতার কারণে এই সমৃদ্ধ শালবনের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পক্ষে চেষ্টা করা হচ্ছে স্থানীয় অরণ্য প্রশাসন বিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে সুস্থায়ী যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং মাঝে মাঝে কি ভাবে অরণ্য সংরক্ষণ ও তার সুস্থায়ী ব্যবহার করতে হয় তার সম্পর্কে শৈশব থেকেই চেতনার সম্প্রসারণ করতে। তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য এবং চেতনা শিবির করতে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে স্থানীয় বন সুরক্ষা সমিতি বা EDC এবং যেসব অভিভাবকেরা অরণ্যে যান তাঁদের অংশগ্রহণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

(৫) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই রয়েছে ২৫০ বছরের প্রাচীন নাটমন্দির। কথিত আছে তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় অঞ্চলে জমিদারী পরিদর্শনের সময় বহুবার এখানে এসেছেন এবং এই অঞ্চলে প্রাচীন রাজ পরিবারের অনেক ভালো কাজের ছবি আছে যা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির সংরক্ষণে স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচ্ছিন্ন ভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে একথা সত্য, তবে যাতে এই স্থানীয় ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিষয় প্রতিমাগুলির সংরক্ষণ-এর মানোন্নয়নে নতুন প্রজন্ম আরো উৎসাহী এবং উদ্যোগী হয় তার জন্য বিদ্যালয়ের ইতিহাস – শিক্ষক মহাশয়কে মাঝে মাঝে এই সব স্থান পরিদর্শনে ছাত্রী-ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

(৬) বিদ্যালয়ের ৯০% - ৯৫% পড়ুয়া কৃষক পরিবারের সন্তান এবং যেহেতু এলাকার কৃষি নানা সংকটের মধ্যে আছে, সেই কারণে আধুনিক প্রজন্মকে, অর্থাৎ যার একাংশকে বিদ্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে, কৃষিমনস্ক করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩ কাঠা জমির ওপরে পুষ্টিবাগান তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে, যার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ারা এবং সহযোগিতা করবে নীচু শ্রেণীর পড়ুয়া দল। এই পুষ্টি বাগানে ব্যবহার করার জন্য বাগানের পাশেই দুটি সুবৃহৎ জৈব সারের চৌবাচ্চা তৈরি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত এলাকায় কমপক্ষে ৫০ -৬০ টি পরিবার রয়েছে, যাঁরা খুব দক্ষতার সাথে জৈবসার তৈরি এবং পারদর্শীতার সাথে তার ব্যবহার করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ

চাষী ভাইকে বেছে নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জৈব সার তৈরি পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়ুয়াদের শেখাবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পুষ্টি বাগানে শাক-চাষ এর উপর ও বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এলাকাতে যারা শাক-চাষে পারদর্শী এবং বিভিন্ন শাকের পৌষ্টিক গুণাগুণ প্রসঙ্গে যাদের খুব স্পষ্ট ধারণা আছে, এরকম তিনজন কৃষকের সাথে বিদ্যালয়ের বাগান পরিচালনায় যুক্ত পড়ুয়া দলকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যারা পড়ুয়াদের এই চাষ সুস্থায়ী ভাবে করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রশিক্ষিত করবে। তবে শুধু মাত্র সংসদ এলাকার বা গ্রামপঞ্চায়েতের কৃষকরাই নয় এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ এবং দফায় দফায় আলোচনা করা হয়েছে জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে। আর তাঁরাও পরিপূর্ণ ভাবে আশ্বাস দিয়েছেন যে যদি ১২-১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের তাদের খামারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তাঁরা নিরীক্ষাকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখাবেন এবং সহজভাবে ছাত্রী-ছাত্রদের সামনে তা বুঝিয়ে বলবেন। এজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে যারা জীবনবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে একটু অগ্রণী ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত, তাদের এই শিক্ষাভ্রমণে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

(৭) মালতীবালা গ্রামপঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবনের দোতলায় আছে সুদৃশ্য একটি অডিটোরিয়াম, যেখানে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন এবং অনুশীলন করার মতো জায়গা আছে। মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েতেই রয়েছে খুব পরিচিত দুখানি নাটকের দল যারা শিশু নাট্য ভাবনায় জেলা ও রাজ্যস্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটাতে পেরেছে। বিদ্যালয়ের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা খুব ভালো ভাবে নাটকসহ অন্যান্য প্রদর্শনমূলক শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার মতো জায়গায় রয়েছে। যদি এই সব শিক্ষার্থীদের এখান থেকেই নাট্যশিল্পের রক্তমাংসের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে তারা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে। সেজন্য এই দুখানি নাট্যদলের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করার বিষয়ে বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রস্তাব রাখা হয় যে যাতে তারা বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করতে পারে।

(৮) স্থানীয় এলাকায় যেসমস্ত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য আছে সেগুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকশিল্পীও আছেন যাঁদেরকে ব্যবহার করে বিদ্যালয়ের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে একদিন দু'ঘন্টার জন্য চর্চা ও শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে তাদের মাধ্যমে এলাকার কিছুটা হলেও লোকশিল্পের ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হতে পারে। সেই জন্য প্রস্তাব রাখা হয় যে অভিজ্ঞ শিল্পীকে বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হোক।

(৯) প্রধানত দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসাবে এই বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির শিকার এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে তাদের রোগ প্রতিরোধের নিজস্ব ক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। তাই প্রস্তাব রাখা হয় যে প্রতি ১৫ দিনে বিদ্যালয়ে একবার স্বাস্থ্য-শিবির করা হোক কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে তা কোনো সময় সর্ব শিক্ষা অভিযান এর অন্তর্গত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে এড়িয়ে না যায় এবং দূর্বল না করে এবং স্থানীয় ব্লকস্তরের সাহায্যে এটা করা হবে।

(১০) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় পৌনে ৩ কাঠা মতো জায়গা আছে, যেখানে গড়ে তোলা হবে প্রধানত ফল, কাঠের এবং সবজি নার্সারী। এখানে উৎপাদিত চারা যেমন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোপণ করা হবে তেমনি তা লাগানোর জন্য বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া যাবে। আশা করা যায় যে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা পুরো প্রক্রিয়াটি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারবে কিভাবে একটি সুস্থায়ী, সুপরিকল্পিত এবং বাণিজ্য সফল নার্সারী সৃষ্টি করা সম্ভব।

(১১) গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় যেসব জমি বছরের বেশির ভাগ সময় প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে, বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রস্তাব করা হয় যে এই রকম ৪-৫ বিঘা জমি চিহ্নিত করে সেখানে পুরোপুরি দেশীয় বীজে সুস্থায়ী পদ্ধতিতে ধান চাষ এর উদ্যোগ নেওয়া হোক। শুধু উৎপাদনের জন্য উৎপাদন নয়, যাতে একটু উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পুরো উৎপাদনচক্রটি ভালোভাবে বুঝতে পারে সে জন্য তাদের নিয়ে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করার বিষয়েও প্রস্তাব করা হয়।

বাইরে থেকে একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার
লাঘব করতে পারিনে.....যার অভাব আছে তার অভাব মোচন
করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই সময়

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান স্কটিশ ইতিহাসবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডব্লু.ডব্লু. হান্টার বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের যে অনুপুঙ্খ ইতিহাস লিখেছিলেন তার মধ্য থেকে দুটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস-অংশটি বেছে নিয়ে তার প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো। আমরা আশা করবো গ্রামীণ-বাংলার শিক্ষাঙ্গনে যে সমস্ত শিক্ষকরা ইতিহাস পড়াচ্ছেন তাঁরা এই রচনাংশ থেকে সমৃদ্ধ হবেন এবং এর তথ্য ও বিশ্লেষণ পড়ুয়াদের নিজেদের মতো করে তুলে ধরবেন।

মানভূম

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ছোটনাগপুর মালভূমির ঢাল নেমে যাচ্ছে ধাপে ধাপে দক্ষিণ বাংলা ধরে। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব দিকের প্রথম উতরাই হল মানভূম অঞ্চল।

লাল মাটির দেশ। ছোট ছোট পাহাড় আর টিলায় ভরা দেশ। সমতল নয়, জমিই যেন ঢেউ হয়ে উঠছে, পড়ছে। লাল মাটি – শক্ত, শুকনো, কাঁকড়ে, ভরা। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে শুকনো লাল মাটি আর গাছহীন প্রান্তর জ্বলে পুড়ে যায়, বিষন্ন দেখায়। আবার বর্ষার দিনে ওই একই জমি কচি ধান গাছে সবুজ হয়ে ওঠে। ছোট ছোট সবুজ বনবাদাড়ে লাল মাটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে উদ্যানের ছবি তৈরি করে। মানভূম অঞ্চলের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক দুটি আরো মনোরম। একেবারে ছবির মতো মানভূম অঞ্চলের উত্তর আর উত্তর – পূর্ব ধার দিয়ে বয়ে চলে বরাকর আর দামোদর নদ। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যায় সুবর্ণরেখা। এছাড়াও, দ্বারকেশ্বর, সিলাই আর কাঁসাই নদী এই জেলাকে ছুঁয়ে যায়। মানভূম অঞ্চলের তিনটি পর্বত শ্রেণীঃ- দলমা পাহাড়, পাঁচকোট বা পাঞ্চেট আর বাঘমুন্ডির পর্বতের গঙ্গাবারি বা গাজবরু শিখর। পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে ভরা। মানভূমে কোন জলাভূমি নেই। নেই কোন প্রকৃতির তৈরি করা সরোবর। যদিও তিনটে বড় বড় সরোবর রয়েছে, যেগুলি মানুষের তৈরি করাঃ- পুরুলিয়া সদরের সাহিব বাঁধ, জয়পুরের রানিবাঁধ আর পাঁদরার পোদারধি বাঁধ। মানভূম অঞ্চলে জলবাহিত যানবাহনের চল নেই। যদিও কাঁসাই আর দামোদর ধরে কাঠ বোঝাই নৌকা চলে। যদিও দামোদর নদের বন্যার মেজাজকে মানুষ ভয় পায়। বর্ষাকালে কয়লা কোম্পানিগুলি কয়লা বোঝাই নৌকা পাঠিয়ে দেয় দামোদর ধরে হুগলী নদীর ধারে কয়লা ডিপোগুলির দিকে। ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়াও মানভূম অঞ্চলে লোহা মেলে। আর পাওয়া যায় সাজি মাটি খনি খাদ থেকে, সাজি মাটির খন্ড খুঁড়ে আনা হয় আর তাই দিয়ে তৈরি করা হয় থালা, বাটি, শিবলিঙ্গ, তৈরি হওয়া জিনিস চলে যায় বর্ধমান আর কলকাতার বাজারে। মানভূম অঞ্চলের বনজঙ্গল সরকারের অধিকারে নেই। সব বনই জমিদারদের ব্যক্তিগত দখলে। কাঠ ব্যবসা করে মহাজনেরা। শাল গাছের বন সাবাড় হয়ে গেল শাল কাঠ কেটে রেলে পটরি তৈরি করতে গিয়ে। মানভূম জুড়ে পড়ে থাকে নিষ্ফলা, অনুর্বর জমি। উৎকৃষ্ট এলাকার জমি তাই উৎকৃষ্ট চারণভূমি। ধান কাটার পর গরু ছাগলের পাল ছেড়ে দেওয়া হয়। সারা বছরই মাঠের ঘাস থাকে রুখা-শুখা। জি টি রোডের ধারের চারণভূমিতে গরু-ছাগল চরানোর জন্য চাষিদের কাছ থেকে সরকার কর আদায় করে।

জাতিগত বিন্যাস

মানভূম অঞ্চলে মূলত আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল তাদেরই ছিল। আর্য জাতির আগমনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আদিবাসীরা যেমন কোণঠাসা হয়ে যায়, তেমনি মানভূম অঞ্চলের আদিবাসীরাও সরতে সরতে নিষ্ফলা, বন্ধ্যা অংশে সরে যায়। তাছাড়া আর্য-হিন্দুরা জনজাতি গোষ্ঠী-যুক্ত মানুষদের মিথ্যা উপাধি দিয়ে হিন্দু সমাজে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। এই ভাবে মূল ভূমিতে জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। তাও মানভূম জুড়ে আদিবাসীরা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে পেরেছে। তার কারণ অধিকাংশ বন কাটা পড়লেও এখন এই জেলা জুড়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। এখানকার মাটি সাধারণ চাষাবাদের জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। আদিবাসী জনজাতির মানুষজন বনজ ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়, আর যে অপর্যাপ্ত ফসল তারা আদিম পদ্ধতিতে ফলায় ,তাতেই তাদের দিন-গুজরান হয়। তাই মানভূম জুড়ে যে বুনো অঞ্চল সেখানে তারা নির্বিবাদে বসবাস করে।

এখানে ভূমিজ কোল জাতির মানুষ অধিক সংখ্যায় বাস করে। ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পর বাঙালিরা মানভূমে প্রবেশ করে। তারা ছাড়াও আর যারা এদেশে বাস করে তারা হলোঃ অসূর বা অগরিয়া, সরব, ভর, ধাঙ্গর, খড়িয়া, নাইট, নাইয়া, নট,

সর্দার, পুরাণ, পাহাড়িয়া আর সাঁওতাল। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার দুই পাড় ধরে ভূমিজ কোলদের বাস ছিল। হিন্দুদের কুর্মি জাতের দল এদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে।

দেশান্তরীঃ কাজের খোঁজে

মানভূম অঞ্চলের বেশ কয়েকটি পরগণা যেমন বরাভূম, পাটকুম, বাঘমুন্ডি ও হেসলা থেকে বহু ভূমিজ, সাঁওতাল, কুর্মি, মুন্ডারি মানুষ দূর আসাম, কাছাড়, সিলেটে চা-বাগানে কাজের খোঁজে পাড়ি দেয়। যারা একবার গেছে তারা খুব কম সংখ্যকই নিজের দেশে ফিরে আসতে পেরেছে। জেলা জুড়ে আড়কাঠিরা ছলে বলে কৌশলে গ্রামের ছেলে, মেয়ে ও বিবাহিত পুরুষ-নারীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চা বাগানের কাজে নিয়ে চলে যায়।

সদর শহরঃ পুরুলিয়া

এই অঞ্চলের প্রশাসনিক সদর শহর পুরুলিয়া। ১৮৬৯ সালে পুরুলিয়া শহরটি পুরসভার আওতায় আসে। এখানে না আছে কোন বড় কারখানা, না হয় তেমন ব্যবসাবাণিজ্য। এই শহরে রয়েছে একটা বড় বাজার। আমদানি করা তুলো আর নুন পুরুলিয়ার বাজার থেকে সারা জেলায় বিক্রি হয়। পুরুলিয়া শহরে রয়েছে ডেপুটি কমিশনারের অফিস, কোর্ট, একটি জেলখানা, একটি পুলিশ থানা, পোষ্ট অফিস, বেসরকারি চাঁদায় তৈরি হওয়া একটি স্কুল বাড়ি ও একটি গির্জা। বেসরকারি চাঁদায় তৈরি হয়েছে একটি দাতব্য হাসপাতাল। স্থানীয় তহবিল দ্বারা সেটির রক্ষণাবেক্ষণ হয়।পুরুলিয়া শহরের দক্ষিণে চাকুলতোড়ে (কাঁসাই পাড় পরগণার অন্তর্গত) মেলা বসে বছরে একবার, চড়ক পূজোর সময়। চাকুলতোড়ের মেলা বসে ভাদ্র মাসে (সেপ্টেম্বর) ছাতা পরবের সময়। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, লোহারদাগা, হাজারিবাগ থেকে ব্যবসায়ী, দোকানিরা পসরা নিয়ে আসে।

দর্শনীয় স্থান

মানভূমের দর্শনীয় স্থান বলতে বোঝায় প্রাচীন কিছু ভগ্নাবশেষ। প্রাচীন কালে এখানে জৈন মতাবলম্বী সরক বা Srawak দের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই জায়গাটার নাম পালমা। এখানে রয়েছে একটা ভাঙা মন্দির। পাথর আর ইঁটের ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রধান মন্দিরের ভাঙ্গা অংশ। মন্দিরের দেবদেবীরা ডালপালা মেলা একটা পুরনো অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে। মন্দির চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরুষ মূর্তি। মূর্তিগুলি বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর চাঁদোয়া দেওয়া। এর মধ্যে একটি মূর্তি বেশ বড়। মূর্তির গড়ন দেখে বোঝা যায় এগুলি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি।

পুরুলিয়ার কাছে ছররা গ্রামে দুটি পাথরের মন্দির রয়েছে। এগুলিকে দেউল বা দেবালয় বলে। সব মন্দিরগুলি জৈন পরম্পরার। ভূমিজ জনজাতি বসবাসের বহু বহু যুগ আগে এ অঞ্চলে অন্য এক সভ্যতার যে বিস্তার ছিল সেটা বেশ বোঝা যায়। জয়পুর শহরের দক্ষিণে কাঁসাই নদীর ডান তীরে বোরান গ্রামের কাছে ইঁট – পাথরের তিনটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাথা উঁচু করে আছে। মন্দির দেওয়ালে গাঁথা ইঁটগুলো দেখে মনে হয় যেন মেসিনে তৈরি করা। বুধপুরেও জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে চড়ক পূজোর মেলায় পাখি বিক্রি হয় – শ্যামা পাখি আর টিয়া। রাজমহল পাহাড়ে ধরা পাখিগুলো মেলা হয়ে পৌঁছে যায় কলকাতার বাজারে।

সুবর্ণরেখার তীরে দালামিতে রয়েছে একটা পুরনো দূর্গ, জলাধার আর সহনো দূর্গ, জলাধার আর শিব-পার্বতীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাঁচকোট পাহাড়ের কোলে রয়েছে পাঁঞ্চেত রাজার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে রাজবাড়ি।

আর্থিক অবস্থা

রেললাইন বসানোর কাজ আর রাণিগঞ্জে কয়লাখনি চালু হওয়ার ফলে মানুষের রোজগারের রাস্তা খুলেছে। তাছাড়া পি ডাব্লু ডি (জনকল্যাণ বিভাগ) তে কাজের সুযোগ বাড়াতে পূর্ব মানভূমের মানুষজনের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে। তবে, সামগ্রিকভাবে গোটা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দরিদ্রই। তাদের চাহিদা কম, নিজেদের জমি জিরেত থেকেই তাদের দিন গুজরান হয়ে যেত কোনরকমে। জেলা আধা – আদিবাসী জনজাতি যারা যেমন বাউরি, ভুঁইয়া, ডোম – এর মতো অন্যান্য যারা ভূমিহীন তাদের পক্ষে দুবেলা খাবার জোগাড় করা বেশ কঠিন। গোটা জেলায় এদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ।

পরিধান, বাসা বাড়ি ও আসবাবপত্র

সাধারণ গরীব গুর্বো পুরুষ মানুষেরা মোটা কাপড়ের খেটো ধুতি পরে, আর গায়ে ছোট চাদর, সেটা কাজের সময় মাথায় বেঁধে নেওয়া হয়। যারাএকটু সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী তারা হাঁটু অব্দি ধুতি পরে, চাদর নেয় বা কখনো পিরান গায়ে দেয়।

মাটির দেওয়াল আর শাল বল্লি দিয়ে ঘেরা খড়ের ছাওয়া কুঁড়েঘরের প্রচলন এখানে। মানভূম অঞ্চলের রেওয়াজ হলো এক কামরাওয়ালা টুকরো টুকরো অনেকগুলো বাড়ি বানানো। মাদুর, মোড়া, পিতলের ও মাটির বাসন ব্যবহার করা হয় রোজকার গৃহস্থ কাজে। খাটের বদলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চারপাই – এর চল ছিল বেশি।

চাষাবাদ

উঁচু নিচু ঢাল আর খাতে ভরা জমি। তাই জমির ঢাল বেয়ে জল বয়ে যায়, বড় জলস্রোত আর নদীর দিকে। তাই পাহাড়ি

ঢালের নিচের অংশে ভেজা জমিতে ধান চাষ করা হয়। পাহাড়ি ঢালে চত্বর কেটে চাষ করা হয়। প্রত্যেক চাষজমির পাশে একটা ছোট বাঁধ খোঁড়া হয় চাষের জল ধরে রাখার জন্য। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে এই ভাবে চাষ করা হয়। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বা কঠিন পাথর থাকার দরুণ যদি চাষ যোগ্য চত্বর কাটা না যায়, তবে বয়ে যাওয়া জলস্রোতের ধারে ধারে ধানক্ষেত তৈরি করা হয়। বর্ষা নামলেই খোদাই করা ধানের চত্বরে জল জমা হয়। শরতের শেষ অব্দি সেই জল ধরা থাকে। ধান, গম, বার্লি, ভূট্টা, মারুয়া, গুন্দলি, কাং, খেরি, কোদো – প্রভৃতি শস্য ফলে। এছাড়াও ছোলা, মুগ, কলাই, মটর, খেসারি, বরবটি, মুসুরি ডাল ফলানো হয়। চোদ্দ ধরনের আউশ ধান এবং বাইশ ধরনের আমন ধান ফলে এখানে। ধান থেকে যেসব ধরণের খাবার তৈরি হয়ঃ চিড়ে, মুড়ি, হারুন (শুকনো ধান), খই, মুড়কি, খইচূড়, রুটি, পিঠে। এছাড়াও ধান সেদ্ধ করে পচিয়ে পাচওয়াই বানানো হয়।

মানভূম অঞ্চলে বছরে বেশ ভালো রকম তসর সিল্ক তৈরি হয়। জঙ্গলের গাছে শুঁয়ো পোকা তৈরি হলে রেশম চাষিরা জঙ্গলে বাস করতে থাকে। পোকাগুলিকে পাখির হাত থেকে বাঁচায়, তাদের উপর নজর রাখে। গুটি হওয়ার আগে অব্দি চাষিরা মাছ-মাংস ছোঁয় না, তেল, হলুদ ব্যবহার করে না। এটা তাদের সংস্কার। এর ফলে নাকি শুঁয়োপোকারা রক্ষা পায়। এরপর গুটি তৈরি হলে সেগুলিকে সংগ্রহ করে, ডিম ফুটে শুঁয়োপোকা বেরোলে তাদের গাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আসন, অর্জুন, শাল গাছে শুঁয়োপোকাগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। এই শুঁয়োপোকা থেকে আবার গুটি তৈরি হয়। গুটি ফুটে মথ্ তৈরি হয়। পুরুষ মথেরা উড়ে গেলেও, ডানা ছেঁটে দিয়ে মেয়ে মথদের রেখে দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

মানভূম অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে যেটা ঘটে, সেটা হল খরা। বন্যার প্রকোপ এখানে নেই। ১৮৬৫ সালে পঙ্গপালের প্রকোপে শস্যের ক্ষতি হয়। আর ১৮৬৬ সালে নেমে আসে ভয়ঙ্কর দূর্ভিক্ষ। ১৮৬৩-৬৪ তে ধানের ফলন কম হয় অথচ ১৮৬৪ তে চালের রপ্তানি যায় বেড়ে। পরের বছর দেখা দেয় ভয়ঙ্কর খরা। আর অতি বৃষ্টিতে আউশ ধানের ক্ষতি হয়। শীতের আমন ধানের ফলনও কম হয়। চালের দাম স্থির করা ও রপ্তানি বন্ধ করার আবেদন পাঠানো হলেও জেলা কমিশনার দায়িত্ব এড়িয়ে যান। জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৬৬-র মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে জেলায় ডাকাতির সংখ্যা ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। কোন মূল্যবান বস্তু নয়, এসময় খাদ্য সামগ্রী লুটপাট করা হয়। মজুতদারেরা চাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। ফলে চড়া দামে চাল বিক্রি হয়। গরীব মানুষেরা তো ছিলই, অবস্থাপন্ন ঘরেও অন্নাভাব দেখা দেয়। বহু মানুষ মহুয়া খেয়েও দিন কাটায়। শস্য লুটের খবরও জানা যায়। তাই জেলায় ত্রাণশিবির খোলা হয়। এই শিবিরে প্রত্যেককে প্রতিদিন আধ সের করে চাল দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। ইতিমধ্যে অনাহারেও বহু মানুষ মারা যায়। কলকাতা থেকে বরাকর অব্দি রেলপথে চাল পাঠানো হলেও বেশিরভাগটাই সুষ্ঠুভাবে মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হয়। বরাকর থেকে পুরুলিয়া সড়ক পথে চাল পৌঁছাতে আরও কিছুদিন সময় নেয়। ততদিনে আরও কয়েকটি ত্রাণশিবির খোলা হয়। চালের দামও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। জমিদারদের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার নির্দেশ দেন যে তারা যেন ১৮৬৬-এর শীতের ফসল রায়তদের হাতেই ছেড়ে দেন। দেনাশোধের নামে যেন চাষিদের ফসল তাঁরা ক্রোক না করেন। এছাড়াও নির্দেশ ছিল যে মহাজনদেরও চাষিদের ফসল ক্রোক করে নেওয়ার অধিকার নেই। ধীরে ধীরে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৮৬৬-এর নভেম্বর মাস থেকে ধীরে ধীরে ত্রাণ শিবির বন্ধ করা হয়। দূর্ভিক্ষজনিত দূর্দশা নিয়ন্ত্রণে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কমিশনারের মতান্তরের বিষয়টি বেশ লক্ষ্যণীয়। দূর্ভিক্ষ আঁচ করে ডেপুটি কমিশনার যখন চাইছেন ত্রাণ তহবিল তৈরি করতে, তখন কমিশনার চাইছেন জমিদাররা যেন তাদের রায়তদের সাহায্য করে এবং তার মতে সরকারের কাজ হবে রোজগারের উপায় বাড়ানোর চেষ্টা করা।

খেলা আর আমোদ প্রমোদ

মানভূম অঞ্চলের সবচেয়ে আমোদ আনন্দের উপকরণ ছিল নাচ। ভূমিজ জনজাতি জীবনে হকির মতো একধরনের খেলার প্রচলন ছিল। কাপড় দিয়ে ভরা আর চামড়া দিয়ে মোড়া বল নিয়ে লাঠির সাহায্যে এই খেলা খেলতে হয়। বলটাকে উঁচু করে ছুঁড়ে দিয়ে দুই দল চেষ্টা করে বিপক্ষের গোলে বলটাকে ঠেলে দিতে। প্রায় দুশো জন মিলে এই খেলা খেলে। খেলতে খেলতে মারপিট হয়। হিন্দিতে এদের পুডি খেল বলে। শিকারও এই অঞ্চলের মনোরঞ্জনের বিষয়।

কৃষকদের অবস্থা

মানভূম অঞ্চলের বেশিরভাগ জমিই ছিল বড় বড় জমিদারদের দখলে। ছোট চাষিরা ১২ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে জমি ব্যবহারের অধিকার পেত। বেশিরভাগ গরীব চাষি ছিল মহাজন আর সুদ ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণগ্রস্ত। রঘুনাথপুর, সিনবাজার আর গোপীনাথপুরে সিল্কের কাপড় বোনার কল ছিল। এখানে বোনা সিল্ক কাপড় রপ্তানি করা হত। লাল বা নীল পাড় সুতির কাপড় তাঁতে বোনা হত। এটি ছিল একটি ঘরোয়া শিল্প। সুতির কাপড় রপ্তানি করা হত না।

স্বাস্থ্যবিধি

রঘুনাথপুর, ঝালদা, মান-বাজারের মতো বড় বড় গ্রাম ছাড়া আর কোথাও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিলনা। যেসব শহর পুরসভার অন্তর্গত সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্ন নেওয়া হত। অধিকাংশ ঘরবাড়িতে আলোবাতাস চলাচলের বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। ঘরের চারপাশ ছিল অপরিষ্কার। চারদিকে শুকনো পচা পাতা, পশুর বিষ্ঠা, হাড়গোড়, ভাঙ্গা মাটির বাসন পড়ে থাকত । তবে পুরুলিয়া সদরের স্বাস্থ্যবিধি সুন্দরভাবে রক্ষা করা হত। পুরুলিয়া আর পান্দরায় দুটো দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র চলত। পুরুলিয়ার হাসপাতালটিতে চিকিৎসার জন্য গড়ে ১৫ জন রুগি রোজ আসত। মে জুন জুলাই মাসে দেখা দিত কলেরার প্রকোপ । এই হাসপাতালে রুগি ভর্তির ব্যবস্থা ছিল। হাসপাতালটি ১৮৬৬ সালে তৈরি হয়। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলনা। পান্দরার চিকিৎসাকেন্দ্রটি ১৮৭২ সালে তৈরি হয়। রানি হিঙল কুমারির অনুদানে হাসপাতাল বাড়িটি তৈরি হয়। প্রতি মাসে রানির তরফ থেকে ও সরকার পক্ষ থেকেও অনুদান পাঠানো হত।

ভূমিজ কোল জনজাতির দুই ধারা

পশ্চিম মানভূমের ভূমিজ কোলরা মুন্ডারি ভাষায় কথা বলে। রুরকে তারা পূজো করে। মস্ত এক সিঁদুর মাখানো শিক্ষা হলো বুরু। বুরুকে বসানো হয় গ্রামের প্রান্তে কুঞ্জবনে। এই বনটিকে পবিত্র মনে করা হয়। শাল আর অন্যান্য গাছে ঘেরা নির্দিষ্ট কুঞ্জবনটিকে সরনা বলা হয়। এখানেই পালন করা হয় সারহুল উৎসব। পূর্ব মানভূমের ভূমিজ কোলরা মুন্ডারি ভাষা ত্যাগ করে। মাঝের অযোধ্যা পাহাড় দুই ধারের মুন্ডা জাতিকে ফারাক করে দিয়েছে। পূর্ব মানভূমের ভূমিজরা নিজেদের আর মুন্ডা বলে না। ভূমিজ বা সর্দার বলে পরিচয় দেয়। বাংলায় কথা বলে। হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি আয়ত্ত্ব করেছে তারা।

কুচবিহার

দ্য স্টেট অফ কুচবিহার। হ্যাঁ এই নামেই পরিচিত ছিল কুচবিহার। পরবর্তীকালে সেটাই হয়ে যায় কোচবিহার। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসেব অনুযায়ী কুচবিহারের আয়তন ১২৯১ .৮৩ বর্গমাইল কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী কুচবিহারের আয়তন দেখানো হয়েছে ১৩০৬ বর্গমাইল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই সেনসাস অনুযায়ী কুচবিহারের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩২,৫৬৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট ১১৯৯ টি। বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮১,৮২০ টি। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৪০৭ জন। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৫২.৩ পুরুষ এবং শতকরা ৩৩.৩ ছিল শিশুর অনুপাত।আর মোট আয়তনের ১০০৯.২৯ বর্গ মাইল ছিল কৃষি এলাকা এবং নদী পুকুর ইত্যাদি বাদে ১৯৫.৪৮ বর্গ মাইল ছিল জঙ্গল এলাকা। সমগ্র কুচবিহার জেলাটিকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি সাবডিভিশনে। সেই তিনটি সাবডিভিশন হল – মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গা।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই সেনসাস অনুযায়ী কুচবিহারের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩২,৫৬৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট ১১৯৯ টি। বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮১,৮২০ টি।

কুচবিহারের রাজারা বংশানুক্রমিক ভাবে এই কুচবিহার শাসন করতেন। দ্য স্টেট অফ কুচবিহারের শাসনের ভার রাজাদের হাতে থাকলেও তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে তা ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে মাত্র ৬৭,৭০০.১৫ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কুচবিহারের রাজারা এই শাসনের দায়িত্ব অর্জন করেছিলেন। সেটা ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু কুচবিহারের রাজাদের হাতে শাসনের ক্ষমতা থাকলেও তার পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ অফিসাররা। এই ব্রিটিশ অফিসাররা কুচবিহারে কমিশনার পদমর্যাদার অধিকারী হতেন।

কুচবিহার ছিল কৃষি সমৃদ্ধ উর্বর সমতল ভূমি। একমাত্র উত্তর পূর্ব অংশে ছিল ঘন জঙ্গল। কৃষির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জলের কোনও অসুবিধা ছিলনা সেখানে। বছরের সমস্ত ঋতুতেই চাষের জন্য জল পাওয়া যেত। যদিও চাষের কাজে নদীর জল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করা হতো না কিন্তু নদী গুলিতে জল থাকত সারা বছর।অর্থাৎ নদীর জলের উপর চাষের কাজ নির্ভরশীল ছিল না। তবে নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকার ফলে সবসময় নৌকা চলাচল করতো। মূলত ব্যবসার কারণে মালপত্র বহনের জন্য নদীপথে নৌকার চল ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুচবিহারে মূল নদীর সংখ্যা ছিল ছয়টি। নদীগুলি হল – তিস্তা, তোর্সা, সিংগিমারি, কালজানি, রায়ডাক এবং গদাধর। কুচবিহারে তোর্সা নদীটি ধরলা বা ধল্লা নামেও পরিচিত ছিল। এসময় কুচবিহারে কিছু কিছু জলাশয়ের কথা জানা যায়। কখনও কখনও নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুরনো গতিপথগুলিতে প্রাকৃতিক ভাবেই কিছু কিছু বদ্ধ

জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কুচবিহারের অধিকাংশ মানুষ জীবিকার জন্য মূলত কৃষির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। কিছু মানুষ অবশ্য নৌকা চালনা, মাছ ধরা ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ছিল কিন্তু তা ছিল মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা দুই ভাগ মানুষ।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রামের সংখ্যা দেওয়া হলেও ক্যাপ্টেন লিউইনের মত উদ্ধৃত করে হান্টার জানান যে দ্য স্টেট অফ কুচবিহারে প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। আসলে এগুলি ছিল এক একটি ফার্ম বা কৃষিখামার এবং সেই সব কৃষিখামারকে কেন্দ্র করে চাষিরা তাদের আত্মীয়-পরিজন সহ বাস করত। তাদের বাড়িগুলি ছিল বাঁশ এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন সব গাছ দিয়ে ঘেরা। ইটের তৈরি বাড়ি ছিল একমাত্র কুচবিহার শহরে। এর মধ্যে কুচবিহারের রাজাদের প্যালেস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্যালেসটি তৈরি হয় কুচবিহারের ১৭ তম রাজা হরেন্দ্র নারায়নের আমলে। কুচবিহার শহরে এসময় কিছু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কথা জানা যায়, তাদের বাড়িগুলিও ছিল ইটের তৈরি। কিন্তু আকারের দিক থেকে সেই বাড়িগুলি ছিল খুব ছোট। এই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা মূলত রপ্তানী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুচবিহারে আরও কয়েকটি বিল্ডিং ছিল, সেগুলি হল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, পাবলিক লাইব্রেরী এবং ছাপাখানা।

> **এখানে আরও উল্লেখ্য**
> যে মাত্র ৬৭,৭০০.১৫ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কুচবিহারের রাজারা এই শাসনের দায়িত্ব অর্জন করেছিলেন। সেটা ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ।

কুচবিহার শহরের সম্পন্ন বাসিন্দারা সে সময় মূলত যেসব পোশাক ব্যবহার করত সেগুলি হল ধুতি, শার্ট, চাদর ইত্যাদি। গ্রামের সম্পন্ন চাষিরা ব্যবহার করত খাটো ধুতি এবং বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ও শীতকালে ব্যবহার করত সুতির চাদর। আর তাদের শোয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল বাঁশের তৈরি মাচান। অর্থাৎ মাচানের উপর শুয়ে তারা রাত কাটাত। তাদের বাড়িগুলি ছিল কুঁড়ে ঘরের মত। তাদের বাড়িগুলি ছিল বাঁশ ও ঘাসের খড় দিয়ে তৈরি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে সে সময় ১০০ টি বাঁশের দাম ছিল মাত্র তিন টাকা। গ্রামগুলিতে যারা সম্পন্ন পরিবার, তাদের বাড়িতে পাঁচ জন বয়স্ক মানুষ এবং তাদের চারজন ছেলেমেয়ে সহ জীবনধারণের জন্য মাসিক খরচ ছিল ২০ টাকা এবং যারা এর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছিল তাদের জীবনধারণের জন্য মাসিক খরচ হত ১২ টাকা থেকে ১৪ টাকা।

> **যেসব পোশাক ব্যবহার**
> করত সেগুলি হল ধুতি, শার্ট, চাদর ইত্যাদি। গ্রামের সম্পন্ন চাষিরা ব্যবহার করত খাটো ধুতি এবং বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ও শীতকালে ব্যবহার করত সুতির চাদর।

কুচবিহারে মূলত ধানের চাষ ই হতো। সাধারণত দুই প্রকার ধানের কথা জানা যায় সেই দুই প্রকার ধান হল –আউস ধান এবং আমন ধান বা হৈমন্তীকা। এর মধ্যে আউস ধান হত সাতাশ প্রকারের এবং আমন ধান ছিল ছিয়াত্তর প্রকার। ধান থেকে চিড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদি তৈরি করার রেওয়াজ ছিল সেই সময়। সেই সময় প্রতি সের চিড়ার দাম ছিল দেড় আনা অর্থাৎ দেড় আনা দামে পাওয়া যেত এক সের চিড়া। মুড়ি বা খইয়ের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তৈরি হতো মোয়া। এই মোয়া বিক্রি হতো প্রতি সের আড়াই আনা দামে । সে সময় চাল সেদ্ধ করে তাকে দু তিন দিন ধরে পচিয়ে এক ধরণের মদ তৈরি করা হতো, যাকে বলা হতো শরাব। এই শরাবের বিক্রয়মূল্য ছিল আট আনা থেকে এক টাকা চল্লিশ পয়সা প্রতি সের। প্রয়োজনে কৃষকরা গৃহপালিত পশুও বিক্রি করত । সে সময় একটি সাধারণ গরুর দাম ছিল দশ টাকা থেকে কুড়ি টাকা এবং এক জোড়া মহিষের বিক্রয়মূল্য ছিল পঞ্চাশ টাকা।

> **সাধারণত দুই প্রকার**
> ধানের কথা জানা যায় সেই দুই প্রকার ধান হল –আউস ধান এবং আমন ধান বা হৈমন্তীকা। এর মধ্যে আউস ধান হত সাতাশ প্রকারের এবং আমন ধান ছিল ছিয়াত্তর প্রকার।

সে সময় কৃষি কাজের জন্য দিনমজুরও পাওয়া যেত। স্থানীয় এলাকায় যারা ক্ষুদ্র চাষি – তাদের নিজেদের জমিতে যখন কোনও কাজ থাকত না, তখন তারাও দিনমজুর হিসেবে কাজ করত। তবে বেশীর ভাগ দিনমজুর আসত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বাংলার বাইরে থেকেও দিনমজুররা কুচবিহারে আসত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরের মাসিক পারিশ্রমিক ছিল ২ টাকা, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয় তিন টাকা এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ৫ টাকা। কৃষি কাজ ছাড়াও রাস্তা তৈরি, মালপত্র বহন করা ইত্যাদি পরিশ্রম মূলক কাজে যারা দিনমজুরের কাজ করত তাদের পারিশ্রমিক ছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ১.৮ টাকা, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিন টাকা এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় মাসিক সাত টাকা।

কুচবিহারে এ সময় দু জন মুসলিম ভূস্বামীর কথা জানা যায়, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে জমির ইজারাদারি নিয়েছিলেন। এদের ইজারাদার বলা হতো। এই ইজারাদারদের অধীনে প্রচুর পরিমাণে মুসলিম জোতদার ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে সময় কুচবিহারে কোনও ইউরোপিয়ান ভূস্বামীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

কুচবিহারে অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি। কিন্তু কৃষি কাজ বাদেও কিছু মানুষ মোটা সিল্কের কাপড় তৈরি করার পেশায় নিযুক্ত ছিল। তারা একধরণের সিল্কের কাপড় তৈরি করত যা লম্বায় ছিল ১৮ ফিট এবং চওড়া ছিল ৪ ফিট। এই কাপড়গুলিকে কুচবিহারে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো এনডি বা এড়ি। এই কাপড় গুলির বিক্রয়মূল্য ছিল প্রতিটি ৬ টাকা থেকে ১০ টাকা। কাপড়ের গুণগত মান অনুসারে এই দাম ধার্য করা হতো। আরও একধরণের কাপড় তৈরি হতো, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো মেখলি। এই কাপড় তৈরি করার জন্য পাট ব্যবহার করা হতো। এই কাপড়গুলি বিক্রি হত প্রতিটি ১২ আনা থেকে ১ টাকা দামে। মেখলিগঞ্জে এই কাপড় প্রচুর

পরিমাণে তৈরি হতো এবং মেখলিগঞ্জের নাম অনুসারেই কাপড়টির নাম হয় মেখলি।

হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের জন্য পরবর্তীকালে কুচবিহারে একটি স্কুলও গড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একজন চাইনিজ ছুতারকে, সেই সঙ্গে কামার, কুমোর প্রভৃতি লোকজনকেও সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এটা উল্লেখ্য যে কুচবিহারে নিয়মিত ভাবে কোনও ম্যানুফাকচারিং কোম্পানি গড়ে ওঠেনি। তবে সাধারণ মানুষরা যারা কৃষিকাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করত, তারা ধীরে ধীরে হস্ত শিল্প কেই মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ এটিই তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে।

কিন্তু কৃষি কাজ বাদেও

কিছু মানুষ মোটা সিল্কের কাপড় তৈরি করার পেশায় নিযুক্ত ছিল। তারা একধরণের সিল্কের কাপড় তৈরি করত যা লম্বায় ছিল ১৮ ফিট এবং চওড়া ছিল ৪ ফিট। এই কাপড়গুলিকে কুচবিহারে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো এনডি বা এড়ি।

কুচবিহারের বাইরে অন্যান্য জেলা থেকে আগত কিছু পেশাদার লোকজনকে এসময় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টেও নিযুক্ত করা হত। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করার জন্য একজন ছুতার এবং একজন রাজমিস্ত্রি পারিশ্রমিক পেত মাসে ৭ টাকা থেকে ২৫ টাকা। এর মধ্যে যারা সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক পেত তারা হল কুচবিহারের স্থানীয় মানুষ। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল ও একটি পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়া কুচবিহারে সে সময় আর কোনও ইন্সটিটিউশন, সোসাইটি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তবে দ্য স্টেট অফ কুচবিহারের সহায়তায় বেশ কিছু বিদ্যালয় চালু ছিল । কুচবিহারে সে সময় কোনও সংবাদপত্রও ছিলনা। একটিমাত্র ছাপাখানা ছিল কিন্তু সেখানে প্রশাসনিক কাজের জন্য বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বিভিন্ন রকম সরকারী নোটিশ, ফর্ম ইত্যাদি ছাপা হতো। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে স্কুল ছিল মাত্র একটি। সেখানে পড়ুয়া ছিল মাত্র ৩৬ জন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৬, পাশাপাশি পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এসময় পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ১৪৮৬ জন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় ২৪৫ টি। পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ৬৪৯৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫২ জন।

কুচবিহারে সে সময় ব্যবসা বাণিজ্যের যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য ছিল মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের হাতে। কুচবিহার থেকে সে সময় রপ্তানি করা হতো তামাক, পাট, সর্ষে বীজ, সর্ষের তেল, চাল ইত্যাদি। আর আমদানি করা হতো সংসারে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, চিনি, গুড়, মশলা, শুকনো মাছ প্রভৃতি। আর এই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কুচবিহার শহর। কুচবিহারে তখন উল্লেখযোগ্য একমাত্র গ্রামীণ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো চৈত্র মাসে কালজানি নদীর ডানদিকের পাড়ে। মেলার মূল স্থানটি ছিল কুচবিহার শহর থেকে এগারো মাইল দূরে। মেলাটি চলত তিনদিন ধরে। মেলাটি গদাধর মেলা নামে পরিচিত ছিল। এই মেলাতে মূলত স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই অংশগ্রহণ করত।

কুচবিহারে তখন উল্লেখযোগ্য

একমাত্র গ্রামীণ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো চৈত্র মাসে কালজানি নদীর ডানদিকের পাড়ে। মেলার মূল স্থানটি ছিল কুচবিহার শহর থেকে এগারো মাইল দূরে। মেলাটি চলত তিনদিন ধরে। মেলাটি গদাধর মেলা নামে পরিচিত ছিল। এই মেলাতে মূলত স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই অংশগ্রহণ করত।

কুচবিহারের আবহাওয়া ছিল মনোরম। অন্যান্য জেলার মতো কুচবিহারে গ্রীষ্মকালে খুব গরম অনুভূত হতোনা। শীতকালে সকালে ঘন কুয়াশা দেখা যেত। সারা বছর ধরেই বইত ঝির ঝিরে বাতাস। বৃষ্টি হতো এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস অব্দি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৫৭.২২ ইঞ্চি এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮৯.৮০ ইঞ্চি।

পরিশেষে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ। কিন্তু মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি অকালে পর লোকগমন করেন। আর তখন তাঁর একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়নের বয়স মাত্র দশ মাস। রাজপদে বসার জন্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নৃপেন্দ্রনারায়ণকে অস্বীকার না করলেও ব্রিটিশরা এই সুযোগে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার স্টেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব পরোক্ষে নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাগটনকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে কুচবিহার স্টেটের কমিশনার নিযুক্ত করা হয়।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে হান্টার যখন কুচবিহার স্টেটের এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন, ঠিক সেই সময় একজন ইংরেজ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাটনা কলেজের ছাত্র হিসেবে অধ্যয়নরত। সময়টা হল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো:
এক ঝলক

সংশোধিত জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো (NCF- National Curriculum Framework) শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সভ্যতা ও অগ্রগতি" লেখাটি থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি দিয়ে, যেখানে কবি আমাদের মনে করাচ্ছেন যে "সৃষ্টিশীলতার আনন্দ" এবং "অনাবিল আনন্দ" ছোটবেলার দুটো প্রধান শব্দ যা বড়রা ভাবতে না পেরে অপব্যবহার করে। শুরুর অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতার সময় থেকে যে পাঠ্যসূচী পরিমার্জনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে সেই বিষয়ে। জাতীয় শিক্ষানীতিই (১৯৮৬), (NPE- National Policy on Education 1986), জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর প্রস্তাব দেয়,যার ফলস্বরূপ শিক্ষার একটা জাতীয় পদ্ধতি তৈরি হয়। প্রস্তাবিত হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি যা জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানে স্থান পায়। প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা এবং মান এই লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে কাজের পরিকল্পনা বিশদে রচিত হয়। প্রসঙ্গত,জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো সংশোধনের কাজটি শুরুর সিদ্ধান্ত হয় NCERT-র কার্যকরী কমিটির সভায় ২০০৪ সালে।

বর্তমান NCF পাঠ্যক্রমের উন্নতিকল্পে পাঁচটি সহায়ক নীতির কথা বলেছে। সেগুলি হল-

১। জ্ঞানকে স্কুলের বাইরে জীবনের সাথে মেলানো

২। উক্ত শিক্ষা যেন মুখস্থ করার থেকে দূরে থাকে তা সুনিশ্চিত করা

৩। পাঠক্রম যেন এতটাই সমৃদ্ধ হয় তা যেন পাঠ্য বইকে অতিক্রম করতে পারে

৪। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সরল করে তাকে স্কুল জীবনের সাথে মেলানো

৫। সংশিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ এই দেশের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে থেকেই সমাজের অবহেলিতদের অস্তিত্বের বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করবে

শিশুরা যাতে একটা সামগ্রিক জ্ঞানের স্বাদ এবং জানার আনন্দ অনুভব করতে পারে সেই জন্য বিষয়ের গণ্ডীকে শিথিল করতে NCF প্রস্তাব দিয়েছে। এর সাথে সেইসব পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বস্তু যা আঞ্চলিক জ্ঞান ও প্রচলিত দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে সেগুলি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া স্কুলে একটি উদ্দীপনাময় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যা শিশুটির বাড়ি এবং এলাকার পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ। ভাষার ক্ষেত্রে ত্রি-ভাষার পুনঃ প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে উপজাতির ভাষাসহ শিশুটির মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম বলে ভাবা হয়েছে। পড়তে ও লিখতে পারা বা শুনতে ও বলতে পারা পাঠ্যক্রমের সব দিকেই শিশুর উন্নতি ঘটায়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রত্যেকটি শিশু যাতে পড়তে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত,কারণ এটাই স্কুল শিক্ষার একটা ভিত হিসাবে কাজ করবে।

অঙ্ক শিক্ষার বিষয়টা এমনই হওয়া উচিত যাতে একজন শিশু চিন্তা করে বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে, দুর্বোধ্য বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, সমস্যা তৈরী করে সমাধান করতে সক্ষম হবে, এই বৃহৎ পরিধির লক্ষ্যে অঙ্ক শেখানোটা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ, যা শিশুটির মনে থেকে যাবে। অঙ্কে ভাল করাটা প্রত্যেক শিশুর অধিকার।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠ হবে প্রান্তিক গ্রুপগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে - NCF-এর এই সুপারিশকে দৃষ্টান্তমূলক বলা চলে। গুরুত্বপূর্ণ (প্রাকৃতিক) বস্তুগুলির সাথে (যেমন-জল)সম্পর্ক গড়ে তোলা। এছাড়াও লিঙ্গ সাম্য এবং তপসিলি জাতি, উপজাতি ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির প্রতি সংবেদনশীলতার বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের সর্বস্তরে যেন স্থান পায়।

এছাড়া NCF আরও চারটে বিষয়কে পাঠ্যক্রমে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে - কাজ, শিল্প ও ঐতিহ্যপূর্ণ হাতের কাজ, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা এবং শান্তি। কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নতুন পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছে, যা শুরু হবে প্রাথমিক- পূর্ব স্তর থেকেই। কাজ জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে অভিজ্ঞতায় এবং সৃষ্টি করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের, যেমন আত্মপ্রত্যয়, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা। বড়দের জন্য জীবনশৈলী সম্পর্কিত পড়াশুনা যা স্কুলের বাইরের সম্পদ থেকে পাওয়া যাবে। NCF কাজের বিষয়টিকে মাথায় রেখে উক্ত বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। স্কুলের বাইরের সংস্থাগুলোর সরকারী আস্থাভাজন বা স্বীকৃত হওয়া দরকার যাতে তারা work bench তৈরী করতে পারে, যেখানে শিশুরা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের সাহায্যে হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে। হাতের কাজের পরিকল্পনাটা এই জন্যই রাখা হয়েছে যাতে এলাকা চিহ্নিত করে শিক্ষকের সাহায্যে কারিগরি শিক্ষাকে হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুদের কাছে সহজে পৌছে দেওয়া যেতে পারে।

শিল্পকলাকে সমস্ত স্তরে একটি বিষয় হিসাবে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার চারটি বড় ক্ষেত্র, যেমন, গান, নাচ, ছবি আঁকা এবং নাটক। কলাশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশমুলক নয়, আলোচনামূলক পদ্ধতির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত সচেতনতা সম্পর্কে উন্নীত করা, তাছাড়াও নিজেকে নানানভাবে প্রকাশ এবং বিকশিত করতে পারার ক্ষমতা। এছাড়া ভারতের ঐতিহ্যময় শিল্প, তা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই হোক বা কারুশিল্পের দিক দিয়ে, তার গুরুত্বকে স্কুল শিক্ষার অন্তর্গত করা দরকার।

স্কুলে শিশুর সাফল্য নির্ভর করে তার পুষ্টি এবং ভালভাবে পরিকল্পিত শরীর শিক্ষার কার্যকলাপের উপর। ফলে মিড-ডে মিলের প্রোগ্রামকে আরও শক্তিশালী করার জন্য স্কুলের সময় ও সম্পদ বাড়ানো দরকার। স্কুল- পূর্ববর্তী স্তর থেকে আরও উচ্চস্তর পর্যন্ত মেয়েদের পুষ্টি ও শরীর শিক্ষার দিকে ছেলেদের সমান নজর

দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার দরকার।

শান্তিকে জাতীয় উন্নয়নের পূর্ববর্তী শর্ত মনে করা দরকার। শান্তির বিষয়টি আজকের দিনে সমাজের মানসিক অবস্থায় মূল্যবোধগত কাঠামোতে আবশ্যক, কারণ বর্তমান পৃথিবীতে বিবাদ মেটানোর পথ হিসাবে হিংসা ও অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শান্তির শিক্ষা শিশুদের সামাজিকীকরণ করবে গণতন্ত্র ও ন্যায়ের সংস্কৃতির পথে, যা কার্যত হবে যথাযথ কাজ এবং প্রত্যেক স্তরে বিচক্ষণতার সাথে এমনই বিষয় ঠিক করা হবে তার মধ্য দিয়ে। শান্তি শিক্ষা পাঠক্রমের এমন একটা বিষয় যা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও বলা হয়েছে।

পদ্ধতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নথিটিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দানের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং একে হাতিয়ার করেই দায়বদ্ধতা বাড়বে আর মান উন্নয়ন হবে।পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত নানান ধরণের স্কুল-ভিত্তিক প্রকল্প সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান তৈরী করতে এবং পরিবেশগত সম্পদ আরও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সৃষ্টি করতে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে।

সর্বশেষে, এই নথি স্কুলের সাথে পঞ্চায়েত, অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী, এন জি ও এবং শিক্ষক সংগঠন গুলিকে একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্যই মূল স্রোতে থাকাটা প্রয়োজন এবং সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে যে সচেতনতা গড়ে উঠেছে সেটাই রাষ্ট্র এবং শিশু সম্পর্কিত সব এজেন্সির যৌথ কর্মকাণ্ডের একটা বিস্তৃত বিষয় হতে পারে।

" জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ "

কিছু নির্বাচিত অংশের সংকলন

("জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫" এর বাংলা সংস্করণ অনুযায়ী পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।)

শিশুদের কী রকম শিক্ষা আমরা যোগান দিচ্ছি?

পড়ুয়াদের বাস্তব জীবনের কাজ- কর্মে বিদ্যালয়ের অর্জিত শিক্ষাকে লাগানো যাচ্ছে না। পরস্পর আলাদা থেকে যাচ্ছে।

(পৃষ্ঠা 2)

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার দিকটি দুর্বল হয়ে পড়ছে। পরীক্ষার পড়া এই কাজে আছে খানিক যান্ত্রিকতা। যা শিশুর শৈশবকে পীড়িত করে। এই প্রকার প্রথাগত লেখা-পড়ার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই বললেই চলে।

(পৃষ্ঠাঃ ৩)

পঞ্চায়েতের ছত্রছায়ায় শিক্ষা সম্পাদনের ইতিবাচক দিকগুলি প্রসঙ্গে 'রূপরেখার' মত

তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তরতম সংশোধন হয়েছে আমাদের সংবিধান। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় কমিটিকে, যাতে স্থানীয় শিশুদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে।

(পৃষ্ঠা ৮)

গ্রাম স্তরে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সমান্তরাল ভাবে কাজ করতে পারে তার উপযোগী একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১২০)

শিক্ষাব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠার ঝোঁক কমে যায়।

পড়ুয়াদের যথাযথ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক বেশি দায়বদ্ধ হন।

বিদ্যালয়গুলি যথেষ্ট ভাবে স্ব-শাসনের ক্ষমতা অর্জন করে।

পড়ুয়াদের চাহিদার প্রতি অনেক বেশি নজর রাখা যায়

স্থানীয় জনজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে জানার উদ্দীপনা বাড়ে।

নিজস্ব পরিবেশে পড়ুয়ারা বিভিন্ন সামর্থ্য অর্জনের অধিকারী হয়।

পড়ুয়ারা চারপাশের পরিবেশ, জীবন ও জগৎ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

পর্যবেক্ষণ করা বিষয়ের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসূচি নির্ভর বিষয় ও তথ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সহজ হয়।

(পৃষ্ঠা ৫)

ভাষা

শিক্ষকরা স্থানীয় ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ সুগম করা, ভাষা শেখান, এবং শেখানোর কাজে ব্যবহারযোগ্য বিষয়বস্তু তৈরি করার ক্ষেত্রে ইনপুট (input) চাইতে পারেন।

(পৃষ্ঠা ৮৭)

একটি বিশেষ পাঠক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গোষ্ঠীকে সরাসরি কাজে লিপ্ত করার সম্ভাবনাগুলি স্কুল খতিয়ে দেখবে। এই সম্পর্ক স্থাপনটা প্রতিষ্ঠানগত শিখনের বিষয় ও শিখন পদ্ধতির অংশগ্রহণকে সাহায্য করবে । আর একটি জরুরী বিষয় হলঃ জন্মাবধি যে ভাষার সঙ্গে এই পর্বের শিশুদের পরিচিতি, সেই ভাষাতেই শেখাতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৬৩)

শিশুদের জ্ঞান ও স্থানীয় জ্ঞান

স্থানীয় পরিবেশ এবং শিশুর গোষ্ঠী – উভয়ে মিলে যে প্রাথমিক ক্ষেত্রটি গড়ে তোলে, তার মধ্যে শিক্ষাদানপর্ব অনুষ্ঠিত হলে তা তাৎপর্য অর্জন করে।

(পৃষ্ঠা ২৭)

শিক্ষা ভবিষ্যৎ গোষ্ঠীজীবনে যুক্ত না হলে তা ফলপ্রসূ নয়, তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

(পৃষ্ঠা ২৮)

মনে রাখতে হবে – স্থানীয় পরিবেশ শুধু কোনো ভৌত বা প্রাকৃতিক জগতে গড়া নয়। এর মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতও রয়েছে। পার্থিব সম্পদে গোষ্ঠী-জীবন উপচে পড়ে। স্থানীয় গল্প, গান, তামাশা, ঠাট্টা, এর সঙ্গে শিল্পকলা সবই বিদ্যালয়ের জ্ঞান ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মৌখিক ইতিহাসের একটা সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তাদের রয়েছে। আমরা নীরব থেকে তাই দিয়ে শিশুদের সরব করতে পারি।

(পৃষ্ঠা ২৯)

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ মিথস্ক্রিয়া এবং সেই সম্পর্কিত বোধ – হাতেকলমে কাজ করা – সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞান – ব্যক্তিগত নান্দনিক দক্ষতা – এসবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

(পৃষ্ঠা ৩০)

স্থানীয় অঞ্চলে 'স্থানীয় জ্ঞান'/দেশজ ও অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়ের জ্ঞানের সাথে তাকে যুক্ত করা।

(পৃষ্ঠা ৩১)

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষার আধেয়, পদ্ধতি এবং ভাষা - শিশুটির বয়স এবং বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া দরকার যাতে বিদ্যার্থীর অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার লালন পালন করা যায়।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিশুর বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে সে যথেষ্ট কর্মমুখী দক্ষতা সহকারে কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারে।

সমগ্র স্কুল পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার বোধ জাগ্রত করতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯)

সমাজ বিজ্ঞান

পরীক্ষার প্রয়োজনে নিছক কিছু সারবাঁধা তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে তাত্ত্বিক অনুধাবনে চিন্তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।যাতে শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতায় দক্ষ করে তোলা যায় এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নের যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৯)

স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা

শিক্ষার্থীর সমগ্র উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষার (যোগ ব্যায়াম সহ) আকর্ষণের মধ্য দিয়ে স্কুলের ভর্তি, ধরে রাখা, এবং স্কুল সমাপ্ত করার সমস্যারও কিছু সমাধান হতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৯)

তবে মনে রাখতে হবে – এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটি হলঃ খেলা, একক এবং দলগত স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে বাস্তব সংযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, দক্ষতা এবং শারীরিক গঠনের বিকাশ ও তার অভিজ্ঞতা।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

স্থানীয় অঞ্চল থেকে খেলা এবং দৌড় প্রতিযোগিতার জন্যে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

খেলাধূলার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে যাতে অবকাশের সময় খেলাধূলা করার জন্যে আরও বেশি সংখ্যক শিশু এখানে আসে এবং দলগত ভাবে খেলা যেন খেলতে পারে। যেমন, ফুটবল, বাস্কেটবল ছোঁড়া, ভলিবল এবং নানান স্থানীয় খেলা।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

আমাদের দেশে বেশির ভাগ শিশু– প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে বিদ্যালয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক পর্ব পর্যন্ত অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের শিকার।

(পৃষ্ঠা ৫৪)

ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

প্রচুর বন্য গাছপালা, ফল, শস্য উপজাতি গোষ্ঠীর দৈনিক আহারে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির উপকরণ-সরবরাহ করে। পুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্ম পরিকল্পনার একটা মূল্যবান উপাদান হতে পারে।

(পৃষ্ঠা ৬২)

হাতে কলমের কাজ (কর্ম এবং শিক্ষা)

পুঁথির শিক্ষা এবং হাতে- কলমে কাজ পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হলে অনুসৃত শিক্ষার পদ্ধতি এবং কাজের হাতিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর সৃজনশীলতার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ পরিবারে গৃহস্থালির কাজ এবং পারিবারিক পেশা বা জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়। আমাদের দেশে মৃৎশিল্পী, হস্তশিল্পী, তন্তুবায়, কৃষক, বৈদ্যের দল এই পথ অনুসরণ করেই নিজেদের বিকশিত করেছেন।এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত স্তরে পর্যায়ক্রমে শারীরিক ও বৌদ্ধিক চিন্তনে যুক্ত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবন, কৌতুহল এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার এইরকম সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটানো প্রয়োজন।

(পৃষ্ঠা ৫৭)

শিল্প-নন্দনতত্ত্ব-চারুকলা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদির

শিক্ষা প্রসঙ্গে 'রূপরেখা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলার প্রসঙ্গটি বারবার গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, সুপারিশ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে শিল্পকলা চর্চার বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় নি।

(পৃষ্ঠা ৫১)

বিচিত্র এবং বিরাট সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সম্বৃদ্ধ আমাদের শিক্ষার্থীরা। তাদের শৈল্পিক দক্ষতায় পুষ্ট করতে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের মনে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি ও মজুত ভাণ্ডারকে সংহত ও ঘনীভূত করতে হবে।...

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জীবন্ত উদাহরণ হল আমাদের শিল্পকলা – একথা স্মরণ রাখতে হবে। শিল্পকলা, তা সে দৃশ্যকলা/প্রদর্শিত কলা হোক আর পরিবেশ কলা যাই হোক না কেন, শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পাঠক্রমে তার উপস্থিতি প্রয়োজন।

শুধু বিনোদন হিসাবে নয়, বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বিকশিত করতে হবে। শিল্পকলার পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থী দেশের সম্বৃদ্ধ এবং বিচিত্র শৈল্পিক পরম্পরার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হবে। বিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিল্পকলার শিক্ষা বিষয় চর্চার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার সুবিধা থাকতেই হবে। নির্দিষ্ট শিল্পকলার চারটি ধারা হিসাবে সঙ্গীত, নৃত্য, দৃশ্যকলা এবং থিয়েটার-সবকটিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিল্পকলার গুরুত্ব বিষয়ে পিতামাতা বা অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫২)

থিয়েটার বা নৃত্য বা মাটির কাজ ইত্যাদি কাজের জন্যে একটানা এক/দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করত হবে।

শিশুর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি এবং শৈলী যাতে ঐসব উপাদানে এবং কাজের দক্ষতায় ও কলাকৌশলে প্রকাশিত হয় সেটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কাজের মান বা 'নিখুঁত' হবার বিষয়টি বড় কথা নয়।

মাধ্যমিকের পর + ২ পর্বে যারা বিশেষ কোন শিল্পআঙ্গিকের বিশিষ্ট পাঠ নিয়ে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইচ্ছাপূরণ-এর জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

শিল্পকলার প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল শিক্ষকের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫৩)

পাঠক্রমের নির্মাণভূমি এবং শিখনের উপাদান

পাঠক্রমের পরিকল্পনার ছক কাটবার জন্যে পাঠ্যপুস্তককেই প্রধান আধার বলে গণ্য করা একটি সরলীকৃত ধারণা।

(পৃষ্ঠা ৮৭)

স্কুল লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা থাকবে যে এটা একটা বোধচর্চার 'জায়গা', যেখানে শিক্ষক, ছাত্র এবং গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা এসে তাঁদের নিজেদের জ্ঞানকে গভীরতর এবং কল্পনাকে প্রসারিত করার মাধ্যম খুঁজে পাবেন।

(পৃষ্ঠা ৮৮)

একমুখী মাল্টিমিডিয়া ও তথ্য সম্প্রসারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের বদলে এদের পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তি করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১২০)

শিক্ষাগত প্রযুক্তি

শিক্ষাগত প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা যাতে হয় সেজন্য সমস্ত স্তরের স্কুলে ET- র সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে যাওয়া খুব জরুরী।

(পৃষ্ঠা ৮৯)

'নেট' দেখে বিভিন্ন 'সাইটে' যেসব ভালোমানের অডিও এবং ভিডিও উপাদান আছে সে প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের জন্য পাঠ্য পুস্তক, ওয়ার্কবুক এবং হ্যান্ডবুক তৈরী করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিতেই ধ্রুপদী সিনেমাগুলিকে প্রাপ্তিযোগ্য করা যায়।

(পৃষ্ঠা ৯০)

অন্যান্য 'অবস্থান' এবং 'জায়গা'

স্থানীয় স্মৃতিস্তম্ভ এবং প্রত্নশালা, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবাস যেমন নদী, পাহাড়, দৈনন্দিন ঘোরাফেরার জায়গা ইত্যাদি সবই পাঠ-প্রক্রিয়ার অংশ।

ক্লাসরুমের কাজকর্মকে যদি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক দিয়ে বেঁধে রাখা হয় ..... তবে তা শিশুর স্বাধীন বিকাশের পথে অনাবশ্যক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

(পৃষ্ঠা ৯১)

বিভিন্ন সোসাইটি এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা

স্কুলের নতুন ধারণা এবং আদর্শ সৃষ্টি করায় শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য উপাদানের উন্নতিতে বিভিন্ন NGO গুলির অনেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

(পৃষ্ঠা ১১৩)

(শিক্ষকদের সংগঠনগুলি) গ্রহণযোগ্য একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বিভিন্ন মান তৈরীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। .. এই ধরণের সংগঠনগুলি আঞ্চলিক স্তরের সংগঠনগুলির সঙ্গে মিশে (BRC/CRC) যৌথভাবে শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয় প্রকৃতি বিশ্লেষণের ও সাহায্য এবং তথ্য সরবরাহের কাজ করতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৪)

জীবন যাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব, এখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টিবাগানের প্রাসঙ্গিকতা

'আমরা চাষ করি আনন্দে-----' এ শুধু সজল বাংলার তৃপ্ত কৃষকের উচ্চারণ নয় ------ এ আজ দিনহাটা অথবা কালচিনির শিশু কিশোরদেরও উচ্চারণ হতে পারে। নবদিশার ভাবনার ভুবনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুষ্টিবাগান একটি অনতিক্রম্য উপাদান। এই উপাদানের সঠিক পরিচালন, যত্ন এবং সম্প্রসারণ নবদিশা ভাবনার অন্যতম স্তম্ভ।

আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি বাস্তুতন্ত্র-সম্মত বিদ্যালয়ের----- আমরা স্বপ্ন দেখি কৃষিমনস্ক একটি প্রজন্মের যে প্রজন্ম কৃষিকে একটি পেশা নয় ----- বরঞ্চ একটি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে ভাবতে শিখবে। তাই বাস্তুতন্ত্র পদ্ধতি মেনে সবজি উৎপাদন করায় আমরা যত গুরুত্ব দিই তার থেকেও বেশি গুরুত্ব দিই শিশুর সাথে একটি লাউমাচার অদ্বৈত বন্ধনের ওপরে। যত প্রকৃতির সাথে দ্বৈতভাব থেকে শিশুর নবীকৃত উত্তরণ ঘটবে, তত সে হয়ে উঠবে পূর্ণ কৃষিমনস্ক সামাজিক মানুষ। এই পুষ্টিবাগান ভাবনার সম্প্রসারণ পর্বে নবদিশার অন্যতম প্রধান সহযাত্রী হিসেবে সামনে এসেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা 'নবদিশা'র মতাদর্শগত প্রেক্ষাপটে অন্যতম প্রধান শরিক এবং গ্রামীণ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে তাঁদের ব্যবস্থাপক হিসেবে অধিকার সংবিধান সম্মত ও সমাজ স্বীকৃত। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুষ্টি বাগান উদ্যোগের সম্প্রসারণ কোনো শৃঙ্খলিত উদ্যোগ নয়। বরঞ্চ এ হলো শিশু আর প্রকৃতির আনন্দযাপন। তাই আজ যখন দূর গ্রামের শিশুরা পূজোর পর থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রবিশস্যের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য, যখন তারা নিজস্ব উদ্যোগে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে আয়োজন করছে বেড়া, মাচা, তরল সার এবং কৃষির দেশীয় সরঞ্জাম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, সেই বীজের, তখন মনে হয়,এরা রাষ্ট্র ভাবনার নয়, বরং সমাজের সন্তান।

নবদিশা খাদ্য সুরক্ষা, অধিকার ইত্যাদি চিৎকার-সর্বস্ব রাষ্ট্রীয় ভাবনার ওকালতি করে না। আমার সংসদ এলাকায় যা আছে তাই নিয়ে, কম ভোগে, কম আয়োজনে আমি বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠবো। এই বোধের সঞ্চারে আমরা শিশুদের হাতে তুলে দিই বীজ, সার। এই শিশু যখন সামাজিক মানুষ হবে তখন সে, তথাকথিত অধিকারবাদে আপ্লুত হয়ে চাষের জল রাষ্ট্র দেবে, বীজ রাষ্ট্র দেবে, বিক্রির বন্দোবস্ত রাষ্ট্র করে দেবে ----- এরকম 'লড়াই' মার্কা ভাবনায় সে বৃথা কালক্ষেপও করবে না। কারণ ততদিনে সে চিনে নিয়েছে নিজস্ব বীজ, বুঝেছে ভূ-গর্ভের জল কতদূর তুললে তা সুস্থায়ীত্বের ইঙ্গিত বহন করে, ততদিনে সে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার করতে শিখেছে ঘরের পাশের পতিত জমি, সে বুঝতে শিখেছে রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বাঁচার ঠিকানা গ্রামের সমাজ – ভাবনার সম্প্রসারণে। আমাদের বাগান – উদ্যোগের মধ্যে পুষ্টি ভাবনাও মিলে মিশে আছে। প্রাকৃতিক সহনসীমা লঙ্ঘন না করে চাষ করলে তবেই হতে পারে প্রকৃত পুষ্টি বাগান। তাই যখন রুক্ষ পুরুলিয়াতে একঘেয়ে মিড-ডে মিলের থালায় আসে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ নটে শাক --- তখন সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ সদস্য বা শিক্ষকদের মনে আশার সঞ্চার হয়। রাষ্ট্রের মিড-ডে মিলের বরাদ্দ শিশুকে স্বাস্থ্যবান করে তোলার সুযোগ দেয়নি, তাই বলে তিনি ভেঙে পড়েননি। বরঞ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তুলে ধরেছেন সৃজনের পরম্পরা, তুলে ধরেছেন বিষের বলয় ছিন্ন করে প্রকৃতির নির্ভয় পথে যাত্রার অসীম সম্ভাবনা। নবদিশার বাগান পালনের মধ্যে তাই যতটা না, না পাওয়ার রাগ থাকে তার থেকে বেশী থাকে সৃজনের আনন্দ। বাগান শিশুকে দেবে এমন এক শুদ্ধতা যেখানে প্রতিটি শিশু আগামীর শান্ত বিপ্লবী। এরা যখন বড় হবে, যখন বুঝবে একটি তৃণ-খণ্ডে আছে বিপ্লবের সম্ভাবনা, তখনই আসবে নবদিশার আসল সার্থকতার মুহূর্ত। কারণ আমরা সফলতায় নয়, সার্থকতায় বিশ্বাসী।

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম

শিক্ষার্থীদের জন্যে তথ্যমূলক রচনা এবং বিশ্বকোষ রচনার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করেনি। 'নেট' দেখে বিভিন্ন 'সাইট'-এ যেসব ভালো মানের অডিও এবং ভিডিও উপাদান আছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক এবং হ্যাণ্ডবুক তৈরি করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতেই ধ্রুপদী (অঙ্গের) সিনেমাগুলিকে প্রাপ্তিযোগ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু যখন গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে পড়ছে তখন তার কাছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি (সিনেমা দেখা) সহজলভ্য হওয়া দরকার – তা সে CRC থেকে আনা CD-র মাধ্যমেই হোক বা জাতীয় ওয়েবসাইটে দেখা হোক। পাঠ্যপুস্তকগুলো এমন ভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন বিষয় এবং নানা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের স্বীকরণ (জ্ঞানকে আত্মস্থ করা) সহজতর হয়ে ওঠে। যেমন, একটি হাইস্কুলের জন্যে লিখিত পাঠ্যবইতে যেখানে রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে অলোচনা করা হচ্ছে আর মীরার নামের উল্লেখ আছে সেখানে তাঁর রচিত (অন্তত) একটি ভজনের বাণীরূপ যেন দেওয়া থাকে; সেই সঙ্গে জানানো থাকে কোন সাইটে ভজনগুলি রক্ষিত আছে, যাতে শিশুরা 'এস এস সুব্বুলক্ষ্মী'র গলায় সেই গান শুনতে সমর্থ হয়।

National Curriculum Framework (2005) পৃষ্ঠাঃ ৩২

বহুমুখী শিক্ষা কি ?

বনের কতিপয় জন্তু একটি স্কুল খুলতে মনস্থ করল। স্কুলে ছাত্র হিসেবে এল একটি পাখি, একটি কাঠবেড়ালী, একটি কুকুর, একটি খরগোস এবং একজন মানসিক প্রতিবন্ধী, এবং সব ছাত্রকেই সব বিষয় নিতে হবে। শিক্ষাসূচীর মধ্যে ছিল আকাশে ওড়া, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, মাটি খোড়া ইত্যাদি ।

পাখি ভালো উড়তে পারে বলে ওড়াতে সে প্রথম; কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে তার ঠোঁট গেল ভেঙ্গে, ডানা গেল মুচড়ে। ফলে ওড়াতেও তার দক্ষতা কমে গেল। সব মিলিয়ে সে পেল তৃতীয় শ্রেণী।

কাঠবেড়ালি গাছে চড়াতে সব সময়েই প্রথম, কিন্তু সাঁতারে ফেল, কুকুর স্কুলে ভর্তি হলো না, স্কুলের জন্য চাঁদাও দিল না। উল্টে "ঘেউ ঘেউ করা" কে পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়ার দাবিতে পরিচালক মন্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল।

মাটি খোঁড়াতে খরগোস প্রথম, কিন্তু গাছে চড়া তার কাছে সমস্যা। কয়েকবার চড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার ফলে সে মাটি খোঁড়াও ভালো করে করতে পারছিল না। ফলে সব মিলে সে পেল তৃতীয় শ্রেণী।

এদিকে মানসিক প্রতিবন্ধী সব বিষয়েই মাঝারি। ফলে সব বিষয় মিলিয়ে সেই হলো প্রথম! পরিচালক মন্ডলী খুশি কারণ একটি বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্র ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু বহুমুখী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো ছাত্রদের যে যে বিষয়ে দক্ষতা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা আছে তাকে ক্ষুন্ন না করে সেই বিষয়ের দক্ষতাকে আরও উন্নত করে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

আমাদের সকলেরই কোনও না কোনও বিষয়ে দক্ষতা আছে, যেমন, হামিংবার্ড খুব ছোট্ট পাখি, এক আউন্সের দশভাগের একভাগ মাত্র ওজন। কিন্তু দেহ এত নমনীয় যে সে খুব জটিল ভাবে প্রতি সেকেন্ডে ৭৫বার পাখা সঞ্চালন করতে পারে। ফলে হামিংবার্ড ফুলের উপর উড়ে উড়ে মধু পান করতে পারে কিন্তু সোজা আকাশে উড়তে বা বাতাসে ভেসে বেড়াতে কিংবা লাফিয়ে লাফিয়ে মাটির উপর বেড়াতে পারে না।

৩০০পাউন্ড ওজনের উটপাখি পাখিদের মধ্যে বৃহত্তম; কিন্তু উড়তে পারে না। কিন্তু এদের পা এত শক্ত যে ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে; এক পদক্ষেপে ১২থেকে ১৫ফুট যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই দক্ষ তাদের নিজস্ব ক্ষমতায়।

শিক্ষার্থীরা কোন জীববিদ্যা শেখে

"এইসব শিশুরা বিজ্ঞানই বোঝে না..... ওরা একেবারে বঞ্চিত, অজ্ঞাত পরিবেশ থেকে আসে!"

– প্রায়শই গ্রামীণ কিংবা আদিবাসী পরিবেশ থেকে আসা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শেখে তা দেখা যাকঃ

রামী, শুশুনিয়া পর্বতের একটি ছোটো গ্রামে বাস করে। সে ধান ও জোয়ার চাষের মরশুমি কাজে তার বাবা-মাকে সাহায্য করে। কখনো ভাইয়ের সঙ্গে ছাগল চরাতে বনে যায়। আর তার ছোটবোনের দেখাশোনার জন্য মাকে সাহায্য করে। এখন সে প্রায় আট কিলোমিটার হেঁটে সবচেয়ে কাছের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে। প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি কাঠ, রঙ এবং ঘর তৈরির উপাদানের মজুত ভাণ্ডার হিসাবে সে বিভিন্ন গাছপালা ব্যবহার করেছে। গৃহস্থালি কাজে, নানা ধর্মীয় আচারে এবং উৎসব উদযাপনে বিভিন্ন উদ্ভিদের নানা অংশ পর্যবেক্ষণ করেছে। বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য তা তার পরিচিত এবং বিভিন্ন মরশুমে তাদের আকার, আয়তন, পাতা ও ফুলের বিন্যাস, গন্ধ এবং চেহারায় কী কী পরিবর্তন হয় তাও সে লক্ষ্য করে। তার জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক যত বিচিত্র উদ্ভিদ চেনে তার চেয়ে শতগুণ বেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ তার পরিচিত, - সেই শিক্ষক/শিক্ষিকা যিনি বিশ্বাস করেন যে, রামী খুবই খারাপ ছাত্রী। আমরা কি রামীর এই সমৃদ্ধ বোধের ভাণ্ডারকে জীব-বিজ্ঞানের প্রথাবদ্ধ ধারণার ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে সাহায্য করতে পারি ? আমরা কি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারি যে বিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞান কেবলমাত্র লম্বা লম্বা পাঠ্যাংশে নানান পরিভাষা সম্বলিত কোনো এক অবাস্তব জগতের কথা নয়। বরং যে খামারে সে কাজ করে, যে পশুদের সে চেনে, যে অরণ্যের সে পরিচর্যা করে, যার মধ্যে দিয়ে সে রোজ হাঁটে এসব তাদের নিয়েই লেখা। কখনো যদি পারি, একমাত্র তখনই সে প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান শিখবে।

National Curriculum Framework (2005) বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠাঃ ৪৪

এ কোন শিক্ষা?
(শিক্ষা বিষয়ক একটি নাটিকা)

[গান ও নাচ করতে করতে শিশুরা মঞ্চে প্রবেশ করে]

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে

[মঞ্চের চারকোণে বেত নিয়ে শিক্ষকরা হিংস্র মুখে নাচতে থাকে।]

[নাচ থামলে হাফ সার্কেলে শিশুরা দাঁড়িয়ে যায়, মঞ্চের অন্য প্রান্তে শিক্ষকরা।]

১ম জনঃ- আমরা শিশুরা পুতুলের মত।

২য় জনঃ- যাচ্ছি ভুলে হাসি খেলা দু'হাত তুলে দুরন্ত ছুট

৩য় জনঃ- বয়স্কদের লোভের চাপে প্রাণের উল্লাস আর মুক্ত জীবন

কোরাসঃ- কখন যেন যাচ্ছে হয়ে লুট

(শিশুরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, সূত্রধরের প্রবেশ।)

সূত্রধরঃ- আমাদের শিশুরা না নাচতে পারছে পারুলদিদির বনে, না মিলতে পারছে চাঁপা ভায়ের সাথে। আজকের বর্তমানে দাঁড়িয়ে ছাঁচে ঢালা শিক্ষা।

১ম জনঃ-আমরা বন্ধু নই কেউ কারো

২য় জনঃ- সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী, কেবল নিজের ভালো

৩য় জনঃ- বাকি সব বিচ্ছিরি

৪র্থ জনঃ- আমাদেরকে নিয়ে মানুষ গড়ার চলছে মহাফন্দি

সূত্রধরঃ- ওদের খেলতে দাও। নিজের খেলা যা কিছু নিজেরা খেলতে পারে। গ্রামের মাটি ওদের চিনতে দাও। ওদের দেখতে দাও গাছের সবুজ, ফুলের শোভা। একজনের সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দহুল্লোড় তুলতে দাও।

৫ম জনঃ- তাইতো আজ আমরা শিশুরা চিনছি না এমন কাউকে

৬ষ্ঠ জনঃ- যার ছবিটা আদর্শ বলে টাঙ্গানো দেওয়ালে।

৭ম জনঃ- সব মহাপুরুষের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো

৮ম জনঃ- বইয়ের পাতায় বন্দি।

৯ম জনঃ- আদর্শ মানুষ আমাদের সামনে একটাও কেউ নেই

সবাই (ঘুরে চলে) নেই ..... একজনও কেউ নেই ..... ছন্দে তালে চারিদিকে সব এলোমেলো।

সূত্রধর- শিক্ষার নামে আমরা একটা কল তৈরি করেছি যাহার নাম ইস্কুল। শুকনো সিলেবাস তৈরির মরা পদ্ধতিগুলো আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

তাইতো আমাদের শিশুরা কিছু না শিখে বছরের পর বছর উঠে যাবে উঁচু ক্লাসে।

১ম জনঃ- পরীক্ষা।

২য় জনঃ- ডিগ্রী

সবাইঃ- শেষে চাকরি।

৫ম জনঃ- উন্নতি হচ্ছে-হচ্ছে উন্নতি। বাড়ি, ঘর, কোথাও নেই কোনো খামতি। আচ্ছা আমাদের খবর কি কেউ রাখেন? আমরা যেন রবি ঠাকুরের অমল। [অমল দইওয়ালার নাটকের কিছু দৃশ্য] [লাঠি দিয়ে একটা জানালা করল অভিনেতারা তার ভেতর অমল সংলাপ বলে।]

অমলঃ- সেই যেখানে ডুমুর গাছেরতলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে তার পরে পুঁটলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগলো। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল।

পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব। আমি যা আছে, সব দেখবো

-কেবলই দেখে বেড়াবো। পিসেমশাই আমাকে পন্ডিত হতে বলো না। [মঞ্চের মাঝখানে আসে]

১ম জনঃ- তুমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হও

ছাত্ররাঃ- না।

২য় জনঃ- তুমি ডাক্তার হও

ছাত্ররাঃ- না।

৩য় জনঃ- তুমি অধ্যাপক হও

ছাত্রদের কোরাসঃ-তোমরা সবাই পণ্ডিত হতে বলছো, রোজগার করতে বলছো,

কিন্তু মানুষ হতে তো কেউ বলছো না!

গান

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে.....

[বৃষ্টি পড়ছে.....সাদা কাগজের টুকরো ওপর থেকে ফেলবে, মনে হবে যেন বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে নাচছে এবং ওদের নাচ দেখে মাষ্টার মশাইরাও বৃষ্টিতে ভিজছে নাচছে।]

একজন শিল্পী গান গাইছে ..... শিশুরা গলা মেলাচ্ছে। কেউ ছবি আঁকছে ..... কেউ গাছ বসাচ্ছে স্কুলের বাগানের জন্য

(পুরো ব্যাপারটাই মাইমে হচ্ছে।) **আচ্ছা এরকম কি হতে পারে না?**

কোন পথে শিক্ষাঃ একটি ছোট গল্প

শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে একটি অজ গাঁ সৃজনপুর। সেই গ্রামেরই কালিমাষ্টারের বড় ছেলে মাধব থাকে শহর কলকাতায়। বড় আপিসে চাকরি করে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সুখের সংসার। তবুও সে ছোটবেলায় গ্রামে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন সে তার বউ মায়াকে ডেকে বলল, 'মায়া চল আমরা আমাদের গাঁ থেকে ঘুরে আসি। শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে থেকে থেকে বড় একঘেয়ে লাগছে;মনটাও টানছে আমার জন্ম ভিটের জন্য।' মাধবের বউ বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেই অজ গাঁ সৃজনপুর! থাকার ভালো জায়গা নেই, লাইট নেই, চারিদিকে নোংরা, ওই পরিবেশে আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে পারব না। তোমার যদি অতই মন টানে তুমি যাও।' মাধব অত্যন্ত কষ্টের সাথে বলে, 'যে গাঁয়ের মাটিতে আমি জন্মেছি তাকে ভুলি কি করে বলতো?' পরের দিন মনস্থির করে সে সৃজনপুরের বাসে উঠে বসে। অনেকদিন পর গ্রামে যাচ্ছে, ভিতরে একটা উত্তেজনাও কাজ করছে। বাস থেকে নেমে সে দেখে তার সেই চেনা সৃজনপুর অনেকটাই বদলে গেছে, কেমন যেন অচেনা লাগে তার। যে বট গাছটার নিচে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা জমাতো সেটাতো আর নেই,অনেক দোকান-পসার হয়ে গেছে, যেখানে মাত্র তিন-চারটে দোকান ছিল।

এইসব ভাবতে ভাবতে আনমনেই হাঁটছিল মাধব। হঠাৎই দেখা নয়ন কবিয়ালের সাথে। "কবিয়াল কাকা" বলে সামনে এগিয়ে যায় মাধব, বলে, "আমাকে চিনতে পারছো কাকা?" কবিয়াল কাকা বলেন, তোকে তো বাবা ঠিক চিনতে পারছি না! আরে আমি তোমাদের কালি মাষ্টারের বড় ছেলে মাধব। সে কবিয়াল কাকাকে প্রণাম করে। তাকে আশীর্বাদ করে কাকা বলেন,'এবার চিনতে পেরেছি; কতদিন পরে তোকে দেখছি তাই ঠাওর করতে পারিনি।তা কেমন আছিস বাবা? শুনেছি তুই কলকাতায় কোন বড় আপিসে চাকরি করিস, বউমা আর ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো?' মাধব-'হ্যাঁ, কাকা সবাই ভালো আছে, কিন্তু তুমি যাচ্ছো কোথায়? আজ কি কোনও গাঁয়ে কবির আসর বসবে?' কবিয়াল-'নারে আমি আমাদের প্রাইমারী স্কুলে যাচ্ছি কবি গান শেখাতে'। মাধব খুব অবাক হয় কবিয়ালের কথা শুনে। কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। কবিয়াল বলেই চলেন,'হ্যাঁরে এ আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ।

এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি কবিগান যাতে প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চারা শিখতে পারে এই উদ্যোগ তারই জন্য।' তিনি খুব গর্বের সাথে বলেন, 'আমি এখন শুধু কবিয়াল নই, কবিয়াল-মাষ্টারও' এই বলে হা হা করে হাসতে থাকেন। মাধবঃ তুমি কি স্কুলে মাষ্টারি পেয়েছ কাকা? কবিয়ালঃ আরে না না সপ্তাহে দু ঘণ্টা করে স্কুলে শেখাই,তবে তার জন্য পঞ্চায়েত একটা সাম্মানিক দেয়। আর কবিয়াল হিসাবে গ্রামের ছেলে মেয়েদের কবিগান শেখানোটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমি একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব কিন্তু এই প্রজন্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবে গ্রামের লোকসংস্কৃতি। নাহলে তারা তো কোনও দিন জানতেই পারবে না এটা কত বড় সম্পদ! 'মাধব অবাক হয়ে শুনতে থাকে। কবিয়াল কাকা বলেই চলেন', অবাক লাগছে তাই নারে? এতদিন তোরা জেনে এসেছিস বই পড়া, মুখস্থ করা, পরীক্ষায় পাস করার শেষে চাকরি। মাধব-হ্যাঁ, সেটাই তো শিক্ষা;আর সেই শিক্ষা পেয়েইতো কলকাতা শহরে বড় আপিসে চাকরি নিয়েছি। সুখের জন্যই তো কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা। আর সবাই প্রতিনিয়ত সেই সুখের পিছনে ছুটে চলেছে। কবিয়াল কাকা- এখন কি হাঁপিয়ে পড়েছিস বলে গ্রামের কথা মনে পড়ল?'

কবিয়াল কাকার মুখে এই কথাটা শুনে মাধব একটু ধাক্কা খেল। এদিকে কবিয়াল তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে স্কুলের দিকে পা বাড়ালেন। মাধব তার ব্যাগ থেকে ঠান্ডা জলের বোতলটা বার করে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিজে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল। কারণ কবিয়াল কাকার কথাটা তার মাথায় ঘুরছে আর সেটা ভাবতে ভাবতেই সে একটা রিক্সায় উঠে সোজা এসে একটা প্রাইমারী স্কুলের বোর্ড দেখে তার সামনে রিক্সাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলল। জিজ্ঞাসা করল, এটাই কি সৃজনপুর প্রাইমারী স্কুল? রিকশাওয়ালা বলল-হ্যাঁ বাবু, এটাই তো এখানকার প্রাইমারী স্কুল। মাধব অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগল যে কত বদলে গেছে সেদিনের স্কুলটা। আগে ছিল খড়ের চাল আর ছোট কুটির; আর এখন পাকাঘর,পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর সেই পাঁচিলের গায়ে সব মনীষীদের ছবি আঁকা। সেইসব ছবি এঁকেছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। তাঁরা সমাজ সম্পর্কে যে সমস্ত মূল্যবান কথা বলেছেন সেগুলোও লেখা আছে। কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও বাকী ছিল। গেট পেরিয়ে স্কুলে ঢুকতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়ল। স্কুলের শুরুতে যে প্রার্থনা সঙ্গীত হতো এখন তার জায়গায় বাচ্চারা কবিগান গাইছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সে গানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং কবিয়াল কাকা।

আরও আশ্চর্য হয় স্কুলে এই সময়ে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে দেখে।হঠাৎ মাধবকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনীবাবু দেখে চিনতে

পেরে এগিয়ে এসে বলেন, 'আরে তুমি কালীবাবুর ছেলে না? দেখেছ, তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছি। আর পারব নাইবা কেন, তুমি যে আমার স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলে'। মাধব মাষ্টারমশাইকে প্রণাম করে। তিনি বলেন-'তা কেমন আছো? শুনেছি তুমি কলকাতায় বড় চাকরী পেয়েছ? বেশ ভাল'। মাধব- 'সব কত বদলে গেছে তাই না?' আমাদের স্কুলের পাশে এই সবজী বাগানটা কারা করেছে মাষ্টারমশাই? মাষ্টারমশাইঃ 'এর পুরো কৃতিত্বটাই এই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের,আমি কেবল পাশে থেকে সহায়তা করেছি মাত্র। আর সবচেয়ে বড় কথা এই উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসীরা সবাই একসাথে

আছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা কি জানো? আজ পরিবার,সমাজ,স্কুল সবই একসূত্রে বাঁধা। স্কুলটা আর সমাজ ও পরিবারের বাইরে একটা দ্বীপের মত হয়ে নেই। গোটা গ্রামটাই একটা স্কুল। এই দেখ না পঞ্চায়েত প্রধানও আজ এখানে উপস্থিত।' এ প্রশ্ন যে মাধবের মনে আসেনি তা নয় কিন্তু সে সংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না,আর তাছাড়া আজ তার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাষ্টারমশাই বলে চলেন, 'স্কুলটা ওনার অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে, সামাজিক সংগঠন হিসাবে এই স্কুলের উন্নয়নের বিষয়ে নজর দিয়ে কিছু করাটা ওনার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।' মাধব ক্রমশই অবাক হয় আর ভাবে যে, স্কুলটা আজ আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমাজের সাথে একেবারে মিশে গেছে। ব্যথিত স্বরে মাষ্টারমশাইকে মাধব বলে, 'আমাদের সময়ে যদি এমনটাই ঘটতো তাহলে আজ আর আমায় গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হতো না,আর মূল্যবোধেরও এমন ভাঙন ধরতো না। মাষ্টারমশাইঃ আসলে পুঁথিগত শিক্ষা কখনও মূল্যবোধের সঞ্চার করতে পারে না। স্কুল জীবনের সাথে বাইরের জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক না থাকলে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয় না।' মাধবের সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের আলাপ করিয়ে দেন মাষ্টারমশাই। বলেন, মাধব আমাদের এই স্কুলেরই প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র, এখন চাকরী সূত্রে শহরে থাকে। পঞ্চায়েত প্রধানের পাশে চেয়ারে বসে সে প্রধান আর ছাত্রদের মধ্যে চলা গল্প শুনতে থাকে। বেশ লাগছিল তার। এরপর পঞ্চায়েত প্রধান ছাত্র ও শিক্ষকদের একটা খবর দেন। খবরটা এইরকম, উনি রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে আগামীকাল থেকেই ছাত্রদের খেলাধূলার জন্য একজন কোচ ঠিক করেছেন, যিনি আগামীকাল বেলা তিনটায় স্কুলে আসবেন সবার সাথে আলাপ করতে। খবরটা শুনে ছাত্র ও শিক্ষক সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। এরপর সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রধান বিদায় নেন।

মাধব প্রধান শিক্ষক অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, 'এখন প্রার্থনার সময় জাতীয় সঙ্গীত না করে অন্য কিছু করা হয়। কিন্তু কেন?' অবনীবাবু বলেন, 'এগুলো আমরা নতুন যোগ করেছি। এছাড়া গ্রামে যারা ভালো গল্প জানেন,যে গল্পের মধ্যে নীতিবোধ বা মূল্যবোধ আছে, সেই গল্পগুলো ছাত্রদের সামনে তাদেরকে দিয়ে বলানো হয়। স্কুলের পাঠ্যক্রমের সাথে অঞ্চলের জ্ঞান ও দক্ষতাকে মেলানোর একটা চেষ্টা বলা যেতে পারে। আর বাচ্চারা যদি নিজের অঞ্চলকে না চিনল তাহলে তো তার শিক্ষাটাই সম্পূর্ণ হলো না। সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা করা হচ্ছে স্কুলের সূচিকে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই। আনন্দের সঙ্গে শিখতে শিখতে ছাত্ররা একদিন এই সমাজের মঙ্গলের জন্য দায়িত্ববান হয়ে উঠবে। সবচেয়ে বড় কথা কি জানো মাধব ? সবাই তো আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে না বা শহরে গিয়ে তোমার মত চাকরিও পাবে না। তারা কি করবে বলো? তাহলে তাদের জন্য পড়ে রইল একটা হতাশাগ্রস্ত জীবন। তাই এখন থেকে যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সারাজীবন তারা কোনও না কোনও কাজ করতে পারে। আর সেই বিষয়ে তাদের একটা দক্ষতা তৈরি করতে চেষ্টা করা।' একথা বলে তিনি মাধবকে সবজী বাগানের দিকে নিয়ে যান। বাগানটা দেখিয়ে তিনি বলেন, 'এই যে বাগানটা দেখছ, এটা গ্রামেরই একজন অভিজ্ঞ চাষীর কাছ থেকে ছাত্ররা হাতে কলমে বাগান তৈরির কাজটা শিখছে। ছাত্ররা জল দেয়, রক্ষণাবেক্ষণ করে আর অভিভাবকরাও তাদের সাহায্য করে। বই পড়ে তারা পুষ্টি সম্বন্ধে জানতে পারছে

আর হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে তাদের একটা দক্ষতা তৈরী হচ্ছে।' মাধব অবনীবাবুর কাছ থেকে সব শুনে বলল, 'এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। স্কুলের সাথে অঞ্চলের এই যে সেতু আপনারা রচনা করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, সত্যি গোটা গ্রামটাই যেন একটা শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের সময়ে যদি এমনটা হতো তাহলে হয়ত আমরা এমন আত্মকেন্দ্রিক ও মূল্যবোধহীন মানুষ হতাম না।'

'এই পথেই হয়ত প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা যায়। আপনাকে তথা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বাঁচার রাস্তাটা আপনারাই দেখিয়ে দিচ্ছেন।' এই বলে মাধব বাড়ীর পথে রওনা হল, তার মনে হচ্ছে, সে আজ গ্রামে না এলে তার অনেক কিছু জানার বাকী থেকে যেত।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY (বিনিময় মূল্য ঃ ১০/-)

নবদিশা ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমরা আশা করি নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ), কলিকাতা- ৭০০০১৯ টেলিফোন নং ঃ ৬৫২২১০৯৭